Vol. 1, No. I July, 2020

-:তিহাস:-

আন্তর্জালিক পত্রিকা

ইতিহাস বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

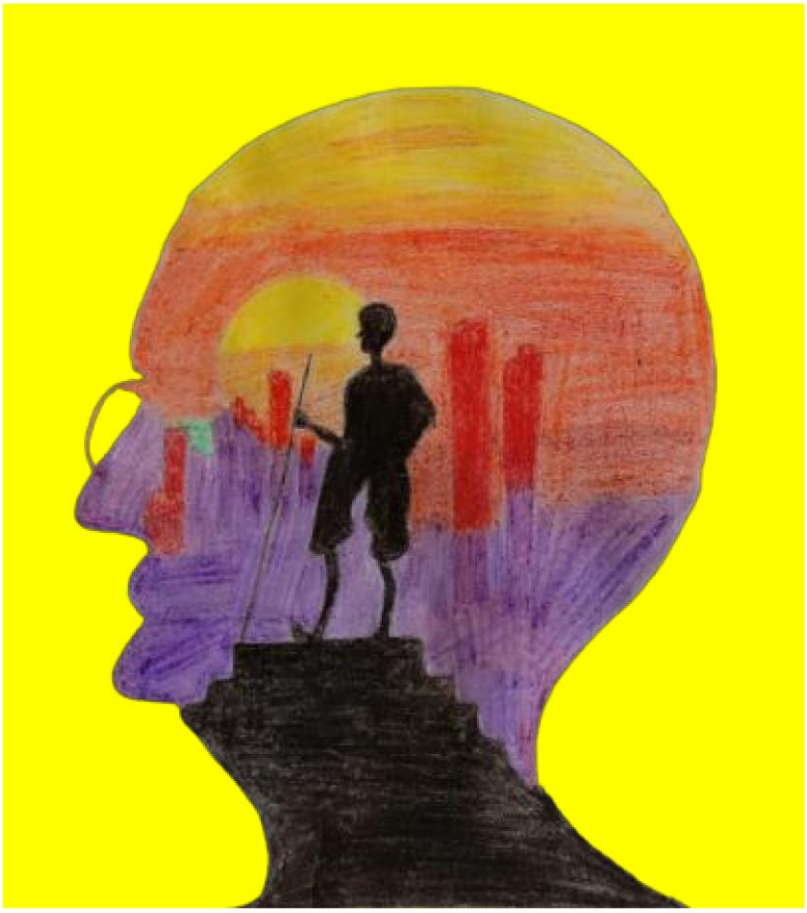

("Tihas" – a Webzine of the Department of History, Maheshtala College)

মহাত্মা গান্ধী জন্ম-সার্ধশতবার্ষিকী সংখ্যা

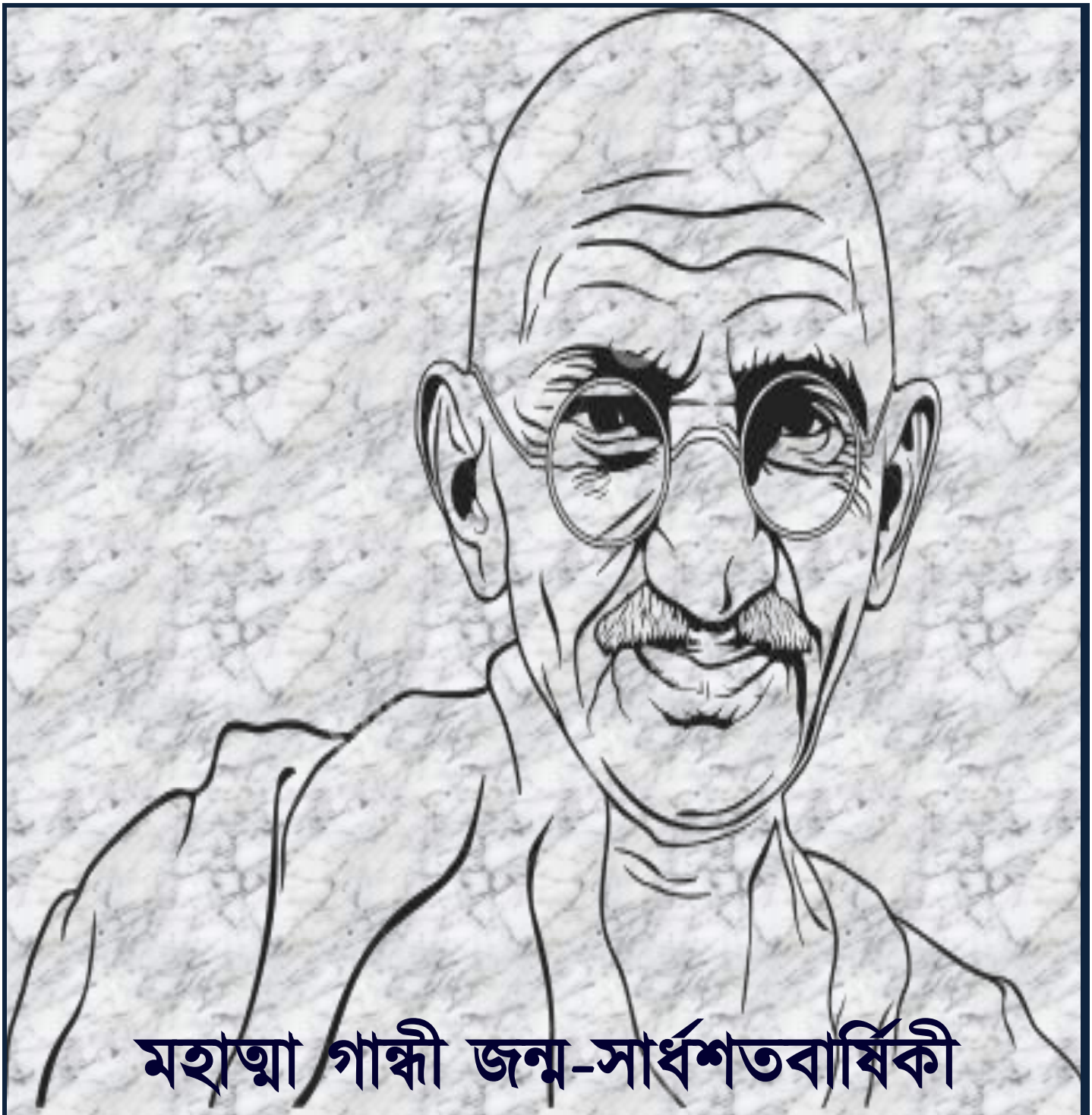

মহাত্মা গান্ধী জন্ম-সার্ধশতবার্ষিকী সংখ্যা

ইতিহাস বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

জুলাই, ২০২০

Vol. 1 No. I *July, 2020*

WEBZINE OF THE DEPARTMENT OF HISTORY MAHESHTALA COLLGE

Chief Editor:

- Dr. Rumpa Das, Principal, Maheshtala College.

Coordinating Editors:

- Prof. Kishore Roy Sarkar , SACT, Department of History, Maheshtala College
- Prof. Ankan Ray, SACT, Department of History, Maheshtala College

Editorial Board:

- Dr. Rupkumar Barman, Head of the Department of History, Jadavpur University, Kolkata
- Dr. Prohlad Roy, Professor of Department of Education, Visva Bharati University.
- Dr. Atig Ghosh, Assistant Professor, Department of History, Visva Bharati University.
- Dr. Sankar Kumar Biswas, Associate Professor and Head, Department of History, Bankura University, Bankura
- Dr. Shoma Chowdhury, Associate Professor, Department of Sociology, St. Xavier's College (Autonomous), Kolkata.
- Dr. Mimi Bhattacharya, Associate Professor, Department of History, Dum Dum Motijheel Rabindra Mahavidyalaya.
- Prof. Amiya Sarkar, Assistant Professor and Head, Department of History, Maheshtala College
- Prof. Sonatan Soren, Assistant Professor, Department of History, Maheshtala College
- Prof. Prasanta Paul, SACT, Department of History, Maheshtala College

-: মুখবন্ধ :-

গত বছর নভেম্বর মাসের এক হালকা শীতের রাত্রে, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে নিয়ে লেখা *'The Good Boatman'* বইটি পড়তে পড়তে একটি দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলেছিলাম। লেখক রাজমোহন গান্ধীকে মহেশতলা কলেজে গান্ধী সার্ধ শতবর্ষে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার একটি আমন্ত্রণপত্র ইমেল মারফত পাঠাই। রাজমোহন গান্ধী হলেন মহাত্মা গান্ধী ও চক্রবর্তী রাজাগোপালচারীর বংশধর - বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, জীবনীকার, গবেষক এবং বর্তমানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যুক্ত। অনেক বছর আগে দিল্লিতে, গান্ধী স্মারকনিধির একটি অনুষ্ঠানে গেছিলাম, সেখানে ওনার সাথে আর গান্ধীর পৌত্রী শ্রীমতী তারা ভট্টাচার্যর সাথে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন আমার বাবা। বাবা তখন খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশনের আধিকারিক আর আমি বোধ হয় স্কুলের অষ্টম বা নবম শ্রেণীর ছাত্রী। তাদের দুজনেরই তখন বয়স হয়েছিল, মৃদুস্বরে কথা বলছিলেন নানা মানুষের সাথে, আর আমি মুগ্ধ চোখে দেখছিলাম তাদের - সেই মহামানব যাকে আপামর বিশ্ববাসী জানে তথা জাতির জনক হিসেবে মানে - সেই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর পরিবারের মানুষ এনারা!

এখন, প্রফেসর রাজমোহন গান্ধীর আরো বয়স হয়েছে, তাই নিজেকে আরও গুটিয়ে রাখেন - কিন্তু ভারতবর্ষের একটি প্রান্তের এক ছোট্ট মহাবিদ্যালয়ের সামান্য আয়োজনের আমন্ত্রণের উত্তর এমনভাবে দিয়েছিলেন, যে সৌজন্য এবং উদারতার পরিচয় পেয়েছিলাম সেদিন - তা কোনোদিন ভুলতে পারবো না। আমার ইমেলের উত্তর এসেছিল ঠিক পরের দিন। কি লিখেছিলেন মহাত্মা গান্ধীর পৌত্র? বাংলা তর্জমা করে তুলে দিলাম খানিকটা অংশ –

স্নেহের রুম্পা,

আপনার আমন্ত্রণ পেয়ে আমি অভিভূত। আপনাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারলে আমি নিজেকে সত্যি সৌভাগ্যবান মনে করতাম।

কিন্তু, শারীরিক দুর্বলতার কারণে আমি আপনাদের আমন্ত্রণ গ্রহনে অক্ষম। আজকাল, আমি ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আগের মত ঘন ঘন যাওয়া আসা করতে পারি না আর। যদিও এই মুহূর্তে আমি ভারতেই, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই আমাকে ফিরে যেতে হবে। আপনি যে videotalk-এর কথা বলেছেন, সেটা করতে পারলে খুব আনন্দিত হব, কিন্তু সবটাই শারীরিক সুস্থতার ওপর নির্ভর করছে। আপনাদের কলেজের কথা জেনে ভালো লাগলো - অনেক কাজ করেন আপনারা ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে, তাদের ভবিষ্যত গঠনের জন্য।

আপনার উৎসাহ এবং কর্মশক্তি আমাকে মুগ্ধ করেছে।

আপনাকে ও আপনার কর্মকে যেন ঈশ্বর সব সময় আশীর্বাদ করেন,

ধন্যবাদান্তে,

রাজমোহন গান্ধী

এই পত্রের উক্তি খুব সাধারণ মনে হলেও, একটুও সাধারণ নয় - তাই সবার সাথে ভাগ করে নিলাম। গান্ধীজি তাঁর সারা জীবনে কর্ম এবং সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাকেই তাঁর ধর্ম হিসেবে দেখেছেন, এবং বিশ্বশান্তির এই পূজারীকেও বিশ্ববাসী সেই রূপেই আরাধনা করেছে এবং আজও করে। জন্মের দেড়শত বছর শুধু নয়, হয়ত আর কয়েক শত পরেও - আমার বিশ্বাস - মহাত্মা গান্ধী ছড়িয়ে থাকবেন আমাদের মনে, মননে। রাজমোহন গান্ধীর মধ্যেও তাঁর বিশ্ববরেণ্য পূর্বসূরীর অসামান্য মানব প্রেম, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অপার বিনয়, অভাবনীয় সৌজন্য প্রকাশ পায়। তাই, তাঁর চিঠি দিয়েই এই সংখ্যার মুখবন্ধ, এই সংখ্যার সূচনা।

মহেশতলা কলেজের ইতিহাস বিভাগের 'তিহাস' আন্তর্জালিক পত্রিকার বিশেষ *''গান্ধী সার্ধ শতবর্ষ''* সংখ্যার প্রকাশনার জন্যে আমি বিভাগীয় সকল অধ্যাপক, ছাত্রছাত্রী, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত শিক্ষক, গবেষক, প্রবন্ধ

- লেখক, শুভানুধ্যায়ীদের আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। এই পত্রিকাটি এমন সুন্দর করে প্রকাশ করার শ্রেয় বিভাগের নবীন দুই অধ্যাপক – শ্রী কিশোর রায় সরকার এবং শ্রী অঙ্কন রায় - এর, এবং এদের দুজনকে সার্বিক সাহায্য করেছেন বিভাগের অন্য তিন অধ্যাপক - শ্রী অমিয় সরকার, শ্রী সনাতন সরেন তথা শ্রী প্রশান্ত পাল। প্রচ্ছদ রচনা করেছেন বিভাগীয় ছাত্রী আলিশা খাতুন।

এই সংখ্যায় বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে গান্ধী - জীবনের নানা দিক আলোচিত হয়েছে - খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন থেকে শুরু করে বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে গান্ধী - দর্শনের প্রাসঙ্গিকতা, গান্ধীজির অর্থনৈতিক, দার্শনিক, ধর্মীয়, দলিত-কৃষক-নারী বিষয়ক গান্ধীর চিন্তা ও চেতনা, তাঁর বর্ণময় এবং কর্মময় জীবনের নানা ভাবনা ও ঘটনা যেমন সত্যাগ্রহ, বর্ণাশ্রম, অহিংসা, বুনিয়াদি শিক্ষা, চম্পারণ, চৌরিচৌরা, দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর সুবৃহৎ কাজ এবং তাঁর প্রত্যহিক জীবনযাপন ও পরিধানের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক - দার্শনিক ভাবাদর্শ - এই সব কিছু স্থান পেয়েছে। সম্পাদক - মন্ডলীর আপ্রাণ চেষ্টার মাধ্যমে এই প্রয়াস আমাদের সকলের প্রনম্য গান্ধীজিকে একটি ছোট্ট শ্রদ্ধার্ঘ্য। পাঠক তাদের মূল্যবান মতামতে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় এই পত্রিকাকে আরো সমৃদ্ধ করবেন, আশীর্বাদ করবেন অধ্যাপক - ছাত্রছাত্রীদের এই আন্তরিক প্রচেষ্টা, এই আশায়।

সকলে ভালো থাকবেন, ভালো রাখবেন। গান্ধীজির দেখানো মহান পথানুসরণ করে আমরা যেন আমাদের আগামীকে আরো ঋদ্ধ, আরো তেজোদীপ্ত করতে পারি, ভারতীয় হিসেবে, মহেশতলা কলেজের সবার পক্ষ থেকে - সেই শপথ নিলাম।

ড. রুম্পা দাস

অধ্যক্ষা, মহেশতলা কলেজ

সূচী

পৃষ্ঠা

1. **Dr Rumpa Das**: Significance of dress and dietetics in Gandhian political philosophy 1
2. **অমিয় সরকার**: খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এবং আবাদি বানু বেগম 4
3. **Subhasis De**: Economic Thought of Gandhi 8
4. **জয়দীপ দত্ত** : আত্মচেতনার রূপরেখায় গান্ধী 10
5. **সনাতন সরেন**: করোনা সমকালীন প্রেক্ষাপট এবং গান্ধী চিন্তা দর্শন : এক সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন 12
6. **প্রশান্ত কুমার পাল** : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মত ও পথে গান্ধী-সুভাষ 15
7. **আশিস নস্কর** : অস্পৃশ্যতাঃ গান্ধীজী ও আম্বেদকার 20
8. **ডঃ কৃষ্ণ কুমার সরকার**: বর্ণ, বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতা বিষয়ে গান্ধি 24
9. **Juyel Ali**: The Philosophical thought of Mahatma Gandhi 31
10. **কিশোর রায় সরকার** : সত্যাগ্রহঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা 34
11. **অঙ্কন রায়** : মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর ধর্মীয় জীবন 38
12. **মেরী আফরোজ** : আইন-অমান্য আন্দোলনে দক্ষিন চব্বিশ পরগণা 42
13. **মিতালী সাধুখাঁ** : গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনে অনুরূপ চন্দ্র সেন ও ছাত্র সমাজের ভুমিকা 46
14. **সৌগত ঘোষ ও তমনাশ মজুমদার** : অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজী 49
15. **সুদেষ্ণা মজুমদার** :নারী কল্যাণ ভাবনায় গান্ধীজি 52
16. **সুজাতা ঘোষ** : গান্ধী এবং তাঁর অহিংস নীতি 55
17. **নুরজাহান খাতুন** : দলিত ভাবনায় মহাত্মা গান্ধী 57
18. **সারিকা সুলতানা ও মেহেজাবিন খাতুন** : বুনিয়াদী শিক্ষা ভবনায় গান্ধীজি 59
19. **রমা জানা ও অনিন্দিতা মণ্ডল** : স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজী 62
20. **মারুফা খাতুন** : চম্পারন কৃষক আন্দোলনের আলোকে গান্ধী 66
21. **গোপাল মণ্ডল** : চৌরাচৌরীর ঘটনা ও গান্ধিজির অহিংস নীতি 69
22. **ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল** : দক্ষিণ আফ্রিকার গণঅধিকার আন্দোলন (১৮৯৩-১৯১৪) 71
23. **পরবর্তী সংখ্যার বিজ্ঞাপন** 74

- **প্রচ্ছদঃ** আলিশা খাতুন, তৃতীয় সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ
- **সম্পাদনাঃ** কিশোর রায় সরকার ও অঙ্কন রায়

Significance of dress and dietetics in Gandhian political philosophy

Dr. Rumpa Das

Principal, Maheshtala College

The image of Mohandas Karamchand Gandhi that is firmly embedded in the collective psyche of all those who have known him through the monumental work that went to establish him as Mahatma is that of a frail but firm person, clothed in a loincloth , with or without a light drape or 'Angavastram' , holding a stick, walking confidently ahead. When one looks at the monochrome photos of his earlier life, in traditional Gujarati attire, his student-sojourn in England dressed in European clothes, sporting a moustache, his days in South Africa at his farm, his later attire appears striking. The British press and British multitude were quite shocked as how he shall go to meet King George V at Buckingham Palace in his loincloth; however, after the meeting, he famously responded that the king was dressed enough for both of them. This article shall try to trace how Gandhi ji's sartorial and dietary choices reflect and symbolize his political philosophy that enabled him and his associates to drive away the British imperialist forces from India: in fact, it was Gandhi's superb political strategy that pitted the icon of an apparently powerless and half-dressed Oriental masculinity against the Occidental concept of a centrifugally powerful and well-draped man who aspires to 'civilize' the uncivilized native/s, but fails since neither food nor clothes not make a man.

As the photographs given above suggest, as long as he was in India before leaving for England for his studies, Gandhi ji was comfortable in wearing the turban, dhoti and kurta

which is still used by natives of Gujarat. He landed at the Tilbury dockyard of London on 18th October, 1888 as a shy 18-year old, and the pomp and grandeur of London bedazzled him. A complete novice in the manner of British etiquette and customs, he was soon deeply distressed by two major concerns – money and food. He had promised to his mother before leaving for England that he would not touch alcohol, stick to vegetarian food and remain faithful to his wife. Though in the later part of his stay, he became a committee leader of the Vegetarian Society of London, chiefly influenced by Henry Salt's *Plea for Vegetarianism,* yet during his stay in England; Gandhi followed the sartorial code of the British, enrolled for ballroom dancing, elocution classes and even tried to learn Latin. He completed his studies in Law from the Inner Temple, and was called to the bar when he was only 22 years of age. He moved to South Africa the next year in 1893 and went on to stay there for 21 years. It was there that he raised a family, and also started his political career as a Civil Rights activist, using non-violence or *ahimsa* for the first time.

Talking about his long stay in Africa, Gandhi said that he was born in India but made in Africa, hinting that his African sojourn shaped his unique personality. It was in Africa, that Gandhi encountered racial and ethnic discrimination and led non-violent protests against the white oppressors. John Ruskin's book, *Unto This Last*, inspired him to set up the Phoenix Farm near Durban, and started training young people in 'Satyagraha'; however, it was Tolstoy Farm - his second farm in Africa where it was actually moulded into a form of political protest. It was here that Gandhi switched his attire from the western form to a humble lungi and shirt, and also changed his diet since he realised that if he would be guilty of practising discrimination if he dressed and ate differently.

On his return from Africa, he started wearing a long coat with lungi, a stole on his shoulder and a turban in his native Kathiawad fashion. He had already started eating a frugal meal, and had given up milk. It was in Madurai, he decided to change his attire and dress like the common men of the country whose cause he was representing. He started using hand spun Khadi fabric, living a simple community life, eating simple meals and going on large spells of fasting as part of his ritual of self-purification and political protest. This event had an immense symbolic value not only for thousands of poor Indians who hailed him as their saviour but also for the world outside who looked at this 'messiah of millions' preaching a new gospel of love, as a modern day Christ-like avatar, as well as the British imperialists who could not negate a frail old man in a loin cloth who had come to negotiate for independence from colonial thraldom.

It is important to note that neither his diet nor his attire brought about 'swaraj' or freedom; it is also equally important to understand that he did not force his ideas on anyone other than his followers. He believed that if a person is unable to control his appetite or his cravings, he becomes '. . . the slave of his body instead of remaining its master' (Gandhi, 242, 2012) It is his desire to reach the truth or 'satya' of human existence ('satya – agraha'/ 'satyagraha' : the desire for truth) that made him vouch for 'ahimsa' or non-violence . Gandhi believed that one need not be or become an ascetic (rishi) to practise ahimsa or seek truth. By leading a life of simplicity and abstaining from excess of any kind, one can seek out truth.

He mainly stressed on having limited quantities of pulses, vegetables and fruits for meals, an active life and preparation of simple meals that may liberate women from the drudgery of cooking them, so as to let them use their time more productively in pursuits of their choice such as gardening, spinning charkha, weaving khadi and so on. He also limited the intake of milk, focussed on naturopathic cure and belief and practice of simple philosophic ideals. Gandhi's interest in mingling his social philosophy has its roots in ancient Indian doctrines, and when combined with his political ideologies, became a veritable tour de force that ultimately led to the setting of the sun on the colonial empire.

Gandhi understood that in a country that is diverse in food, dress and culture, it is neither practical nor possible to enforce/encourage similar tastes – yet, by his own experiments with truth in life, he could motivate them to follow the underlying principles of satya/truth, ahimsa/non violence and sarvodaya/mass-awareness that would culminate in construction of a 'nation'al consciousness. Once this is achieved, the nation – in spite of its multiculturalism and diversity – will become unstoppable. He rightly observed that earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed. The image of the Father of the Nation – Mahatma Gandhi, walking ahead in the form of in statues, photographs, installations, placed all over our country and even abroad, serves this iconic purpose – in his apparent frailty, he is strong; in his powerlessness, he is most powerful; in his most simple poise, he sends the most important message to the world that is and shall always be relevant across the borders of place and beyond the boundaries of time.

.....

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এবং আবাদি বানু বেগম

অমিয় সরকার
বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ,
মহেশতলা কলেজ

অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সাথে খিলাফত আন্দোলনকে যুক্ত করে গান্ধীজি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতিতে মুসলিম ঐক্যের কথা প্রচার শুরু করেন এবং দেশের নারীসমাজকে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। দেশের নারীসমাজকে তাদের সর্বস্ব ত্যাগ করে আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ , বিদেশি দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ এবং সুতো কেটে দেশীয় বস্ত্র শিল্পের উন্নতির জন্য আবেদন জানান। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কে রাবন-রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, যে সীতা কখনোই রাবণের সঙ্গে সহযোগিতা করেননি। তাই, ভারতীয়রা কখনোই রাক্ষস সরকারের (ব্রিটিশ) সঙ্গে সহযোগিতা করবে না। মুসলমান নারীদের এই আন্দোলনে যুক্ত করার জন্য তিনি পাবনা জেলায় অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তৃতায় ব্রিটিশ শাসনকে শয়তানের শাসন বলেছিলেন এবং ইসলামকে এই শয়তানের কবল থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি মুসলিম নারীদের বিদেশি দ্রব্য বর্জনের আহ্বান জানিয়েছেন। গান্ধীজির ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বহু মহিলা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

১৯২০ সালে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকে যেসব মহিলা নেত্রী যুক্ত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন খিলাফত আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা মোহাম্মদ আলী এবং শওকত আলীর মা আবাদি বানু বেগম। আবাদি বানু বেগমের স্বামী ছিলেন মৌলভি আব্দুল আলী খান। ১৮৮০ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর পর তিন পুত্রের জননী আবাদি বানু বেগম জীবন সংগ্রামের হাল ছেড়ে দেন নি। অনেক কষ্টের মধ্যেও তিনি তাঁর তিন পুত্র - জুলফিকার আলি, শওকত আলি এবং মহম্মদ আলিকে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। শিক্ষা শেষে তাঁর দুই ছেলে মায়ের নির্দেশে সরকারি উচ্চপদের চাকুরির লোভ ত্যাগ করে দেশ ও সমাজের সেবায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করেন। এমনকি, বৃদ্ধ বয়সেও স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পরতে পিছুপা হন নি। বহু ত্যাগ ও বলিদান করা এই মুসলমান জননীকে সারা দেশবাসী সম্মানের সঙ্গে 'বি-আম্মা' অর্থাৎ জনগণের শ্রদ্ধার জননী বলে ডাকেন।

আবাদি বানু বেগম খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাণী প্রচার করতে থাকেন। প্রথমদিকে প্রগতিশীল মুসলমান নেতাদের স্ত্রী–মা-বোনেরাই কেবলমাত্র 'বি-আম্মা'র আন্দোলনের সঙ্গী হয়েছিলেন। মূলত, এদের মাধ্যমেই তিনি দেশের ঘরে ঘরে সভা ও বৈঠক করতেন এবং ক্রমে সমগ্র মুসলমান নারীসমাজে জাগরণ দেখা দেয়। খিলাফত এবং অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য যেহেতু এক, তাই হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে এই দুই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

১৯১৭ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন বি-আম্মা। কংগ্রেসের এই সভায় সভানেত্রী ছিলেন সদ্য জেলফেরত অ্যানি বেসান্ত। এছাড়াও এই সভায় উপস্থিত অনান্য সভ্যদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সরোজিনী নাইডু। উল্লেখ্য, এই সভা থেকেই 'বন্দেমাতরম' এবং 'আল্লাহ্-আকবর' সমবেত আওয়াজ তোলা হয়েছিল। বি-আম্মা প্রথম মুসলমান সমাজের ঐতিহ্য ভেঙ্গে পুরুষ-অধ্যুষিত রাজনৈতিক সভায় ভাষণ দেন। কংগ্রেসের এই সভায় তিনি উর্দুতে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার সারমর্ম হল— 'দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য প্রয়োজন হলে স্বামী-পুত্রদের জেলে পাঠাতে হবে এবং নিজেদের ভয়-দ্বিধা পরিত্যাগ করে প্রয়োজনে কারাগার বরণ করে নিতে হবে। আমার সন্তানের স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য কারাবরণ করেছে। আর সেজন্য তাদের মা হিসাবে আমি গর্ববোধ করি।'

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের প্রচারের জন্য বি-আম্মা গান্ধীজীর সঙ্গে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন। বি-আম্মার ভাষণে প্রভাবিত হয়ে বাংলার মুসলিম সমাজের মধ্যে অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে যোগদানে হিড়িক পড়ে যায়। চাকুরি ও ওকালতি ছেড়ে বহু মানুষ ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হন। বাংলাদেশের এক সভায় তিনি বলেছিলেন, আমি আজ আমার মাথার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করছি। কারণ আমি মনে করি সভায় যারা উপস্থিত হয়েছেন, তারা সকলেই আমার শওকত ও মোহাম্মদের মত পুত্র-সম। আর আমি চাই আমার সন্তানেরা যেন একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া কাউকেই ভয় না পায়, কারাবাস তো দূরের কথা ফাঁসিতে যেন মৃত্যু ভয় না আসে। আমার দুই পুত্র কারারুদ্ধ! কিন্তু এই মহুরতে আমার কোটি পুত্র আমার চারিদিকে।

বি-আম্মার ডাকে সাড়া দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ, হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে দেশের সমস্ত স্তরের মানুষ দলে দলে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আমেদাবাদ নিখিল ভারত মহিলা কনফারেন্সের এক সভায় প্রতিনিধির সামনে এক ভাষণে মহিলাদের গান্ধীর স্বদেশী কর্মসূচিতে যোগদানের জন্য আবেদন জানান। লাহোরে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি বলেন, "The Indians have committed two follies during the last 150 years; it was they who sided with the British which brought about the capture of their own king and secondly they helped the English during the outbreak of 1857. If Indians have not done so there was no possibility of these merchatns getting supremacy in India and shakling Indians in the fetters of serfdom..... would they commit another folly and put their aged mother to shame? "

এভাবে বি-আম্মা সারা জীবন ভরে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কথা প্রচার করে গেছেন। রাওয়ালপিন্ডি থেকে শুরু করে গুজরানওয়ালা এবং কাসুর প্রভৃতি স্থানে সভা করেছেন। ১৯২২ সালে সিমলায় এক সভায় মহিলাদের খাদি ব্যবহার করার অনুরোধ করেন। এরপর তিনি পাঞ্জাব, পাটনা ও ভাগলপুরে সভা করেন। ভাগলপুর সফরকালে তাঁকে রাজনৈতিক বন্দীদের সাথে সাক্ষাত করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এর ফলে, রাজনৈতিক বন্দী এবং তাদের আত্মীয়-পরিজনদের পক্ষ থেকে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানানো হয়।

বি-আম্মা গান্ধীজীর স্বদেশি চেতনার উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। অনুরুপভাবে গান্ধীজিও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও স্নেহ করতেন। ১৯২২ সালের মার্চ মাসে গ্রেফতারের আগে গান্ধীজি বি-আম্মাকে তাঁর হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করেন এবং তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার আহ্বান জানান। এরপর যতদিন বি-আম্মা বেঁচে ছিলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, গান্ধীজীর আদর্শ ও স্বদেশীর প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯২৪ সালের নভেম্বর মাসে এই বাগ্মী, বীরাঙ্গনা জননী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মহীয়সী নারী বি-আম্মার মৃত্যুর পর গান্ধীজি বলেছিলেন, "She (Be-Amma) realized that the freedom of India was impossible without Hindu-Muslim unity and khaddar. She, therefore, ardently preached unity which had become an article of faith with her. She had discarded all her foreign or mill-made clothing and taken khaddar ".

বি-আম্মার মৃত্যুতে শোকাহত হাজারে হাজারে হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে তাঁর শবমিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। সেদিন, এই শবমিছিলে মানুষের মনের ফুটে উঠেছে গভীর শোক ও বেদনা। আর এই বেদনাকে কবি কাব্যিক রূপ দিয়েছেন এভাবে ---

'আলিদের মাতা নহ, মাতা সারা হিন্দের
ভারতের সব কৌমধর্মের নর-নারী বৃন্দের।
তুমি চেয়েছিলে দেশের আজাদী, তুড়ে দিতে শৃংখল
মুক্তি যুদ্ধে আমাদের তুমি বুকে দানিয়াছ বল।
দরদী আম্মা, জান্নাত হতে কর আশিস দান
অচিরে আজাদ হয় যেন মাগো মোদের হিন্দুস্থান।'

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপেই নারী এসেছে তার সাহস তিতিক্ষা ও আত্মত্যাগের জ্বলন্ত প্রেরণা নিয়ে, যা পুরুষকে উৎসাহ ও সহায়তা দিয়েছে। মাদাম ভিকাজি কামা প্রথম বিদেশে ভারতের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পরিকল্পনা করেন, তা স্টুটগার্টে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে পেশ করেছিলেন। সেই সময় থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতাকাল পর্যন্ত অগণিত মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে সকলেই ইতিহাসে শিরোনাম পাননি। কারণ, অনেক সময়ই নারীসমাজ অন্তরাল থেকে বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন, তাদের আশ্রয় দিয়েছেন, তাদের হয়ে বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। আবার, অনেক নারীকে দেখা গেছে বীরাঙ্গনার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নারী কখনই পিছপা হননি। সুতরাং জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে মূলস্রোতের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থেকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নারীসমাজ তাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন। সেইসব নারীদের পাশে 'বি-আম্মা' এক উজ্জ্বল তারকা হিসাবে ইতিহাসের পাতায় থেকে যাবেন।

"Communal harmony is imperative to win freedom."

– Abadi Bano Begum
(1852–1920)

Economic Thought of Gandhi

Subhasis De
Assistant Professor, Economics Department
Maheshtala College

Mohandas Karamchand Gandhi, who played the central role in the peaceful achievement of India's freedom, had exposure to the British Society after the industrial revolution and had experienced the British rule in India and South Africa and formulated his critique on it. On the other hand, Gandhi's economic philosophy was mainly concerned with the individual dignity and welfare of poor people. Gandhi's stress on individual liberty includes a sense of responsibility towards oneself, to others, to society, and perhaps to the world beyond.

Gandhi did not isolate economics from other sciences, particularly from ethics. Economics should aim at the material and moral progress of society. It must help in producing and increasing wealth and also promote social justice and moral progress. The following are the main ingredients of his economics:

- Long before the independence of India, he pointed out the significance of the basic strength of the masses in building up the nation's property. Gandhi considered human beings as wealth and not gold and silver. He considered a country to be richest if it nourished the greatest number of happy individuals. Thus in Gandhian economic thought, a human being occupied a more prominent position than wealth.

- The village, as the centre of economic growth, has been always given the prominent importance in Gandhian economics. He recognised that "India lives not in a handful of her big cities but in 700,000 villages. If India is to attain true freedom and through India, the world also, then sooner or later, the fact must be recognised that people will have to live in villages and not in towns, in huts not in palaces....". Gandhi's vision of "Village Swaraj", i.e., the establishment of a village republic, was based on man-centred, non-exploiting, decentralized, simple village economy providing for full employment to each of its citizens based on voluntary co-operation and working for achieving self-sufficiency in the basic requirements of food, clothing and other necessities of life.

- The third ingredient of Gandhian economics was integrated rural development. Gandhi wanted a sort of agro-industrial economy based on the principles of decentralized democracy and social justice. The village industry programme plays a predominant role in providing employment opportunities to rural artisans more specifically the socio-economic weaker strata of the society.

- Gandhi had definite ideas about the use of machines. He maintained "I am aiming not at eradication of all machinery, but limitation...Just where machinery ceases to help the individual and encroaches upon his individuality, its use should go." In other words, he was not against big machinery but he objected to the "craze for machinery". He wanted his machinery to be of the most elementary type which could have put in the homes of the millions. Gandhi offered Khadi as a sign of patriotism, equal opportunity, and independence.

It is a pity that the above-discussed teachings and experiments of Gandhi had little influence on the official policies of the Government of India. There was a craze for massive industrialization and a decline of enthusiasm for such causes as village self-sufficiency through small and cottage industries.

.....

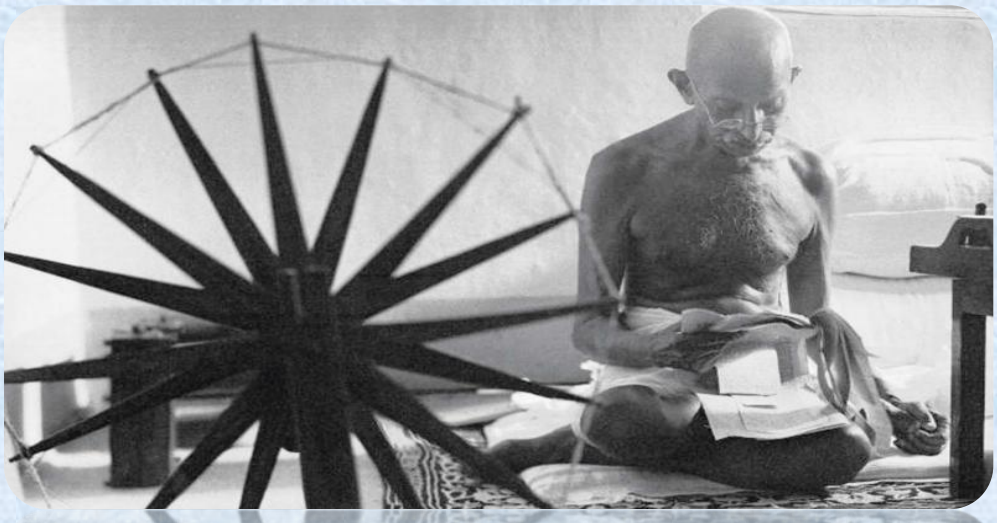

আত্মচেতনার রূপরেখায় গান্ধী

জয়দীপ দত্ত

পিএইচ. ডি. গবেষক, টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সাইন্সেস

আত্মনির্ভর চিরকালে আমাদের মনে এক অদ্ভুদ অনুভবের সংযোগ ঘটায়, যার সন্মুখে কখন একান্তে বা কখন আদর্শের ভিত্তিতে আমরা নিজেদের স্বাধীন, স্বনির্ভর, সর্বোপরি হিসাবে প্রত্যক্ষ দর্শন করি। এই আত্মনির্ভরতার উচ্চ আদর্শের ভিত রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্টিত হয় মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জীবনশৈলী ও আত্মসচেতনতার মধ্যে দিয়ে। 'মহাত্মা' বা 'জাতির জনক' আমাদের গান্ধীর সঙ্গে নতুন পরিচয় ঘটায়, যা প্রকাশ পায় 'অহিংসা' সত্যাগ্রহের মত দৃঢ় রাজনৈতিক আত্মপ্রত্যায় এবং তাঁর জাতীয়করনের মধ্য দিয়ে। ব্রিটিশ-শাসিত ক্ষনকালে এই আত্মচেতনার উপলব্দি শাসনমুক্ত, শোষনমুক্ত এক আত্মপ্রত্যায় রূপের আবির্ভাব ঘটায়, যা তৎকালীন ব্রিটিশ সমাজের যুক্তিপূর্ণ প্রমান সাপেক্ষ চিন্তাধারার সঙ্গে সমকামীরূপে অবস্থান করে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী পাশ্চাত্য দর্শনের অনুরূপে হিন্দুধর্মকে যুক্তিবাদী ধারনার আলোকে আলোকিত করেন। সমাকামীতার ভাব প্রকাশ পায় গান্ধীর পাশ্চাত্য দর্শণের সামাজিক মূল্যবোধ গ্রহনের মধ্য দিয়ে, যা ব্রিটিশ সমাজে বর্ন এবং লিঙ্গ বৈষম্যের চিহ্ন বহন করে। আত্মগর্ভবোধ বা উচ্চ আদর্শের ধারনার অধিকারী হওয়ার সামাজিক মূল্যবোধ ইংল্যান্ডে বৈজ্ঞানিক যুক্তির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্টিত হলেও ভারতে ব্রিটিশের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং ব্যবসায়ী স্বার্থের আড়ালে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর কলোনী স্থাপন তাদের যুক্তিপূর্ণ সামাজিক চিন্তাধারাকে পৌরষিকতার রূপে পরিণত করে। ফলত, এই পৌরষিকতা নিয়ে শিক্ষিত মহলে সমালোচনা এবং গান্ধীর নিজস্ব উপলব্ধি তাঁকে ইউরোপীয় যুক্তিবাদী বিচারকে নতুনভাবে ভাবতে উৎসাহিত করে।

আফ্রিকায় ব্যারিস্টারি পড়ার সময় সেখানে বর্ণ ও লিঙ্গবৈষম্য মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে এই সামাজিক সংস্কার প্রতিকারের জন্য ন্যায়, সাম্য ও নৈতিকতার প্রতি অনুরাগী করে তোলে, যা তিনি যুক্তিপূর্ণ বিচারের মধ্যে দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করেন। গান্ধী যখন তাঁর পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে আফ্রিকা থেকে ভারতে ফেরেন, তখন ইউরোপীয় চিন্তাভাবনার যুক্তিগত জায়গা অনুকরন করলেও ব্রিটিশদের ক্ষমতায় পৌরষিকতার নীতির সঙ্গে ভিন্ন মত প্রসন করেন। গান্ধী হিন্দুধর্ম অনুসরনে 'অর্ধ পুরুষ ও অর্ধ নারী' ধারনার ভিত্তিতে পুরুষের মধ্যে নারী সুলভেরও অধ্যায়ন করেন। 'অহিংসা' বা নন-ভায়লেন্স গান্ধীকে ব্রিটিশ-শাসিত জনসমক্ষে এক নতুন রূপে

উপস্থাপন করে। তিনি হিন্দুধর্মের অনুসরনে ক্ষমতার কৃতিত্বকে নতুন রূপ দেন এবং ইউরোপীয় ধ্যানধারনা ও পাশ্চাত্য দর্শনের সন্মুখে ভারতীয় সমাজে স্বাধীন ও আত্মনির্ভর হওয়ায় পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করেন।

সত্যকে খোঁজার প্রতি তাঁর অনুসন্ধান এবং ক্ষমতা ও জাতিগত বৈষম্যের সমস্যাকে গভীরভাবে ভাবার প্রচেষ্টা গান্ধীকে তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কলোনিয়াল রীতিনীতির বাইরে এক একক মাত্রা দেয়। আশিষ নন্দীর '*The Intimate Enemy Lass and Recovery of Self Under Colonialism*' বইটিতে এই বিষয়বস্তুর উপর আরো গভীরভাবে আলোচনা করা হয়েছে। লেখক, এই বইটিতে গান্ধীর নৈতিক মূল্যবোধ ও জাতীয় রাজনীতিতে সেই ভাবনা সম্প্রসারনের সম্ভাবনা নিয়ে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক যুক্তির অবলম্বনে হিন্দুধর্মের চর্চা গান্ধীর উচ্চ আদর্শ ও সত্যের আধার হলেও আত্মনির্ভরতা দেশীয় সামাজিক কাঠামোর বৈষম্যকে প্রাধান্য দেয় না। বরং, উপনিবেশিকতার আবরনে এই ভাবনা চিন্তা, এক আধুনিকতার রূপ নেয়। লিঙ্গ ও বর্নবৈষম্যের সমস্যা হিন্দুধর্মের নিজস্ব জাতিগত সমস্যাকে উপেক্ষা করে। হিন্দুসমাজে বৈজ্ঞানিক যুক্তিচর্চার অবকাশ শুধুমাত্র হিন্দুর উচ্চবর্ণগত মানুষদেরই বিষয়াধীন ছিল। ফলত, গান্ধীর চিন্তাভাবনার রূপরেখা একদিকে ব্রিটেন ও ইন্ডিয়া এবং অন্যদিকে হিন্দু ও খ্রীষ্টানিটির সংস্কৃতিক ভিন্নতাকে অতিক্রম করে ধর্মনিরপেক্ষ, স্বাধীনচেতা ও অতিপৌরিষিকতার সাক্ষ্য বহন করে। এতে গান্ধীর নিজস্ব সত্যতা থাকলেও তিনি পশ্চিমী জগতের আর একজন জীবন্ত উদাহরন হয়ে যায়।

.....

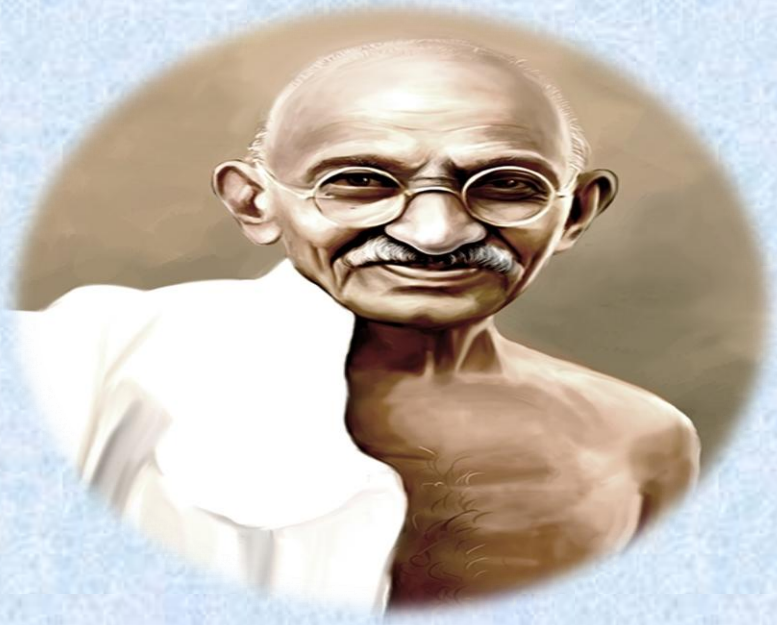

করোনা সমকালীন প্রেক্ষাপট এবং গান্ধী চিন্তা দর্শন : এক সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন

সনাতন সরেন

সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

মহেশতলা কলেজ

"Generations to come will scarce believe that such a one as this ever in flesh and blood walked upon this earth." - Albert Einstein

সময়ের গতিধারা কি এমনিই যা মনীষীদের সোচ্চার কণ্ঠে উদ্ভাসিত করে নতুন পথে চালিত হয় জনসমষ্টি, নাকি অগোচরে থাকা কেউ হঠাৎ সম্মুখে এসে খুলে দেয় নতুন দিগন্ত। বিতর্ক চলতেই থাকবে। বিংশ শতকের সমাজ পরিবর্তনের তথা রাজনৈতিক পরিবর্তনের একাধিক চরিত্র আমরা দেখি, তাদের অসামান্য অবদান দীর্ঘতর ছাপ রেখেছে নিজস্ব ক্ষেত্রে, সমস্ত প্রতিভাকে ছাপিয়ে যাঁর শান্তি, সত্য, অহিংসার বাণী ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে জগৎকে প্রভাবিত করেছিল, তিনি হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী(জন্ম: ২ই অক্টোবর, ১৮৬৯; মৃত্যু- ৩০শে জানুয়ারি ১৯৪৮)। সময় আপন বেগে বয়ে যায়, সমস্যার সমাধানে হিংসার আশ্রয় নিত্ত-নৈমত্তিক ঘটনা। কিন্তু একটা মানুষ এক বিশাল জনসমাজকে যে অহিংসা ও সত্যের বাণী শুনিয়ে অতিকায় শক্তিকে বস মানাতে বাধ্য করেছিলেন, তার সার্থকতা না খুঁজে বর্তমান 'করোনা অতিমারি' আমাদের দেখিয়ে গেল ভারতের মতো বৃহৎ জনসমষ্টির দেশে গান্ধীজীর চিন্তা ধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা একান্ত দরকার। জাতিভেদ-বর্ণভেদ এবং ধর্মের বিশেষ আবরণ ছিন্ন করে শান্তির সুশীতল ছায়া প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সেদিন হরিজন আন্দোলনে যেমন অগনিত মানুষ এক হয়েছিল আজও তেমনভাবেই একত্রিত করবে বলেই আশা রাখি।

তাঁর ধর্ম ও আধ্যাত্মবোধ-এর ধারণায় কী ছিল, যা ধারণ করে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় তাকেই তিনি 'সত্য ধর্ম' বলে মনে করতেন। প্রার্থনা ও উপাসনাকে তিনি ধর্ম পালনের শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মনে করতেন। এর মাধ্যমে আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটতো। পাশ্চাত্য ফেরত মানুষটা সনাতনী ঐতিহ্যকে কোনো বিতর্ক ছাড়াই কত সুন্দরভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। চারিদিকে এত জীবনের আত্মহনন যখন মনকে বিষাদগ্রস্ত করে, মনে হয় কেন এরা পরিচিত হয়নি এই মানুষটির জীবন দর্শনের সাথে। আজকের আত্মনির্ভর ভারতের

স্লোগানের সেদিনের বিতর্কিত চড়কার কি অদ্ভুত মিল না! আজকের তীব্র চিনা দ্রব্য বিরোধিতার সাথে সেদিনের খাদির মিল খুঁজে পেয়েছি? আসলে এই একাত্মতা ও স্বাদেশিকতার যে পথ গান্ধিজী দেখিয়েছিলেন, আজও তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গান্ধিজীর জীবনদর্শন কেন প্রযোজ্য, এই সময় পৃথিবীর বুকে করোনার মতো অতিমারির প্রকোপে গোটা বিশ্ব। এই প্রেক্ষাপটে এক দেশ অন্য দেশকে সন্দেহের চোখে দেখছে। এই মেরুকরণকে হারাতে পারে একমাত্র সত্য ও অহিংসার পথই। রোগের টিকা যেন প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়- বিল গেটসের এই কথা যেমন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, গান্ধিজী বহু পূর্বেই সমমূল্য-সমঅধিকারের কথা বলে গেছেন।

অর্ধাহারে-অনাহারে প্রান্তিক মানুষের যন্ত্রণা সেদিনও ছিল আজও আছে। তাদের অধিকারের স্বীকৃতির জন্য গান্ধিজীর লড়াই আদর্শনীয়। শত্রু যতই শক্তিশালী হোক অহিংসা ও সত্যের বাণী জয় আনবেই। দক্ষিণ আফ্রিকার সেদিনের লড়াইয়ে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হয়েছিল অগণিত অধিকারহীন মানুষ। অনমনীয়, ইস্পাতকঠিন মানসিকতা, ভারত-চীন সীমান্ত বিবাদ সম্পর্কে যথার্থই দেখতে পাই। সর্বোপরি, জাতিবিদ্বেষের হিংস্রতায় ভারত যখন জ্বলছে, মানুষটি জীবন দিয়ে সে আগুন নেভানোর চেষ্টায় রত ছিলেন। ১৯৪৮ সালের 30শে জানুয়ারি রক্তলোলুপ বুলেট প্রাণ নিয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু রেখে গেছে 'আদর্শের বটবৃক্ষ'।

করোনা আতঙ্কে বিশ্বায়িত অর্থনীতি আজ এক গভীর সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে। বিশ্বের ছোটো দেশ থেকে শুরু করে বৃহৎ ও শক্তিশালী দেশগুলোয় কিন্তু আজ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধ লড়ছে। 'ইন্টারন্যাশনাল ম্যানিটারি ফান্ডের' (IMF) মতানুসারে করোনা প্রকোপে বিশ্বায়িত অর্থনীতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। ১৯৩০ সালের 'গ্রেট ডিপ্রেশন' পরবর্তী পর্যায় এটাই সর্ববৃহৎ আর্থিক বিপর্যয় অর্থাৎ মানুষ কর্মহারা হতে চলেছে। ২০২০ সালের মধ্যেই গ্লোবাল ইকোনমির গ্রাফ তিন শতাংশ হ্রাস পেতে চলেছে। প্রথম বিশ্বের আর্থিকভাবে সুরক্ষিত দেশগুলো আজ এই প্রশ্নচিহ্নের মুখে। ফ্রান্স, স্পেন, ও ইতালির জি.ডি.পি যথাক্রমে ২১.০৩ শতাংশ, ১৯.০২ শতাংশ এবং ১৭.০৫ শতাংশ হারে ধাক্কা খেতে চলেছে। এহেন পরিস্থিতিতে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি একান্ত প্রয়োজন, প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। ভারতবর্ষ তাই গান্ধিজীর পথ অনুসরণ করে আত্মনির্ভর তথা আভ্যন্তরীন উৎপাদন ও স্বাদেশিকতার উপর বেশি জোর দিয়েছে। অর্থাৎ, গান্ধিজীর স্বরাজের আদর্শ কোথাও গিয়ে আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠে। গ্রামীন গণতন্ত্রের কর্মযজ্ঞে তিনি গ্রাম পুনর্গঠনের কথা বলেছেন। এই আত্মশক্তির চিন্তা গান্ধি-ভাবনার মূলে প্রোথিত আছে। শুধু তাই নয়, করোনা সংকট যখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল পরিবেশ

সচেতনতা আমাদের জন্যে ঠিক কতটা জরুরি, না হলে অচিরেই মানব সভ্যতার অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে। আর সেখানেও গান্ধিজীর চিন্তাদর্শন আমাদের সঠিক পথ দেখায়। রবীন্দ্রনাথের পর গান্ধিজী-ই বোধহয় বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণের জনমুখী কাজকর্মের উপর একান্ত গুরুত্ব আরোপ করেন।

নতুন আশা আলোকে সামনে রেখে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, হিন্দু-মুসলিম, ছুত-অচ্ছুত ব্যবধানকে মুছে ফেলে হাতে হাত রেখে চলার বা লড়াই করার যে সাহস তিনি দেখিয়েছিলেন আজ বোধহয় এই সাহসেরই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। ক্ষুদ্র সমস্যাগুলি দূরে সরিয়ে একে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রয়োজন। গান্ধিজী এই সাম্যের স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আসুন না আর একবার স্বপ্নটা দেখা যাক।

.....

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের মত ও পথে গান্ধী-সুভাষ

প্রশান্ত কুমার পাল
শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ,
মহেশতলা কলেজ

জাতীয় কংগ্রেসে মতপার্থক্য ও ব্যক্তিত্বের সংঘাত প্রায় সূচনালগ্ন থেকেই ছিল। কিন্তু, ১৯১৯ সালে মহাত্মা গান্ধী ও নেতাজী সুভাষকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, তা আমাদের ১৯০৭ সালে সুরাট অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থী বিরোধের কথা মনে করিয়ে দেয়। উভয় ক্ষেত্রেই কংগ্রেস এক চরম সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছিল এবং পরস্পর বিবাদমান গোষ্ঠীর মধ্যে এক চরম তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। উভয় ক্ষেত্রেই কংগ্রেসের প্রচলিত মতাদর্শের বিরোধিতার প্রতীক তারুণ্যের পরাজয় হয়েছিল প্রতিষ্ঠিত প্রবীন নেতৃত্বের কাছে। ১৯০৭ সালে সুরাটে অবশ্য চরমপন্থীরা পরাজিত হলেও যথেষ্ট দলভারী ছিলেন। লাল-বাল-পাল, এই ত্রয়ী ছিলেন চরমপন্থীদের তিনটি প্রধান স্তম্ভ। তাছাড়া অন্যান্য নেতাও ছিলেন। কিন্তু, ১৯৩৯ সালে সুভাষ একাকী, নিঃসঙ্গ, তাঁর পাশে তখন কেউ ছিলেন না এবং শেষপর্যন্ত কংগ্রেসে ঠাই হয় নি। সুভাষকে গড়তে হয়েছিল নিজস্ব দল 'ফরওয়ার্ড ব্লক'। কংগ্রেস ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধী-সুভাষ বিচ্ছেদের তাৎপর্য অপরিসীম। এর ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরবর্তী ধারা দুটি সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করেছিল। মূলধারাটি অবশ্যই ছিল গান্ধীর নেতৃতাধীন কংগ্রেস পরিচালিত অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রাম; অপরটির নায়ক ছিলেন নেতাজী সুভাসচন্দ্র বসু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহন করে বিদেশী শক্তির সাহায্য নিয়ে তিনি সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য এ ধরনের পরিকল্পনাও সম্পূর্নরূপে অভিনব ছিল না। বিপ্লবাত্মক নেতারাও অনেকটা এই পথেই ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তবে, তাদের প্রয়াস ছিল বিক্ষিপ্ত। সুভাষের মত বলিষ্ঠ কোন নেতৃত্ব তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে গিয়ে এগিয়ে আসেনি। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুভাষের স্বপ্নকে সফল করার জন্য যে সুযোগ এনে দিয়েছিল, আগে তা পাওয়া যায় নি। তবে, এই সুযোগ গ্রহন করাও মোটেই সহজসাধ্য কাজ ছিল না এবং এর জন্য সুভাষকে অনেক মেহনত করতে হয়েছিল।

গান্ধী-সুভাষ এই বিরোধ কি নিছক ব্যক্তিত্বের সংঘাত, না এর পিছনে কোন মতাদর্শ বা তাত্ত্বিক প্রশ্ন জড়িত ছিল? এই লড়াই কি কংগ্রেসে ক্ষমতা দখলের লড়াই? এই সংঘর্ষ কি প্রবীন বনাম নবীনের সংঘর্ষ? মৌলানা আজাদের দৃষ্টিতে মতাদর্শ বিরোধ এই সংকটের সৃষ্টি করেনি। সুভাষচন্দ্র ও তার অনুগামীরাই এই সংকটের জন্য দায়ী। জওহরলাল নেহেরুও এই দ্বন্দ্বকে ব্যক্তিগত সংঘাত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে, অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী এই মতের বিরোধিতা করে মন্তব্য করেছেন "সুভাষ-গান্ধী বিরোধ ব্যক্তিগত কারনে ঘটেছিল বললে শুধু ইতিহাসের অতি সরলীকরন করা হবে না, উভয়ের প্রতি অন্যায় করাও হবে"।

আসলে গান্ধী-সুভাষ বিরোধ একই সঙ্গে মতাদর্শগত বিরোধ ও ব্যক্তিত্বের সংঘাত ছিল। উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ছিল এক প্রকার অনিবার্য। গান্ধীর প্রতি সুভাষের শ্রদ্ধা থাকলেও উভয়ের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য ছিল দূরতিক্রম্য এবং দুজনেই নিজ নিজ মত ও পথে অবিচল। বস্তুত, ১৯৩৯ সালে এই বিরোধ চুড়ান্ত রূপ ধারন করলেও গান্ধীর অনেক নীতিই সুভাষের মনঃপূত ছিল না এবং দীর্ঘদিন ধরেই তিনি তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতে দ্বিধা বা সংকোচ করেনি। গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য আন্দোলনের সমালোচনা করতে তিনি ভীত হন নি। বস্তুত কংগ্রেসের যে বিষয়টি নিয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন, তা হল গান্ধীর প্রতি কংগ্রেস নেতাদের অন্ধ আনুগত্য ও তাঁর সমালোচনা করতে তাদের দ্বিধা ও সাহসের অভাব। সি.আর.দাস, মতিলাল নেহরু এবং লাজপত রায় এদের মৃত্যুর পর কংগ্রেসের অবস্থা আরও খারাপ হয় এবং গান্ধীর সমালোচনা করার মত কেউ ছিল না। গান্ধীর বিরোধিতা ও সমালোচনা করে সুভাষ তাঁর সৎসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। সুভাষের দৃষ্টিতে গান্ধী ছিলেন একজন প্রাচীনপন্থী সংস্কারবাদী নেতা, যার প্রধান সমর্থক ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি শ্রেনী। তাঁর আপোষকামী মনোভাব ও গনরোষের সামান্যতম বহিঃপ্রকাশ এক ধরনের ভীতি ও আশঙ্কা, যার দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি আন্দোলনের রাশ ঠিক সেই সময়ে টেনে ধরেন, যখন গণআন্দোলন একটা সুস্পষ্ট ও পরিণত রূপ পায় – যা সুভাষের মনঃপুত ছিল না। জনগণের নেতা হলেও তিনি যেভাবে জনগণকে পরিচালিত করেছিলেন, যেভাবে তাদের আবেগের সুযোগ গ্রহণ করে বিপথগামী করেছিলেন, সুভাষ তা সমর্থন করতে পারেনি। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় থেকেই বিশেষত গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর সুভাষ গান্ধীর নেতৃত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েন এবং ভিয়েনা থেকে এক যৌথ বিবৃতিতে তিনি ও বিঠলভাই প্যাটেল জানালেন যে, গান্ধীর নেতৃত্বে ব্যর্থ হয়েছে এবং কংগ্রেসের পুনগঠন অপরিহার্য। গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি ক্রমবর্ধমান এই অনাস্থা গান্ধী সুভাষ বিরোধের

ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। সুভাষ চাইছিলেন স্ট্যালিনের মত নেতা। গান্ধীর কাছ থেকে এই ধরনের নেতৃত্ব আশা করা যায় না।

গান্ধী এবং সুভাষের লক্ষ্য ছিল এক কিন্তু লক্ষ্য পৌঁছানোর পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। সুভাষ গান্ধীর মতো পুরোপুরি অহিংসনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। প্রয়োজনে হিংসাত্মক নীতি গ্রহণেও পক্ষপাতী ছিলেন। জীবনের প্রথম পর্বে সুভাষ গান্ধীর অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম পর্বের নরমপন্থী মনোভাব গান্ধীর উপর প্রভাব বিস্তার করে। গান্ধীর দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের সাফল্য তাকে উৎসাহিত করে। প্রতিবাদের এই পদ্ধতি তিনি ভারতে প্রয়োগ করেছিলেন। গান্ধী এবং সুভাষের উত্থানের প্রেক্ষিত ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। গান্ধী একজন আইনবিদ, আর সুভাষ আই.সি.এস., তাই আইনবিদ স্বাভাবিকভাবেই সতর্ক, চতুর এবং লক্ষ্যে অটল, যা গান্ধির মধ্যে দেখা যায়। অপরদিকে সুভাষ ছাত্র জীবন থেকেই বরাবর অগ্রণী ছাত্র এবং অজেয়কে জয় করার প্রেরণা তাঁর মধ্যে ছিল। গান্ধী অনেক প্রবীন তাই তাঁর মধ্যেকার শান্তভাব সুভাষের মত তরুণ প্রজন্মের মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। সুভাষের উত্থান যখন ঘটেছে, তখন বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু গান্ধীর উত্থানের সময় এই ধরনের পরিস্থিতি ছিল না।

এই সময়ের আর একটি বড় ঘটনা গান্ধীর প্রেরনায় নারীরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে। এই সময়ে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন মাথা চাঁড়া দিচ্ছে। অর্থাৎ নারী শক্তি, যুবশক্তি এবং শ্রমজীবি শ্রেনীর উত্থান ঘটেছে। বিপুল পরিমাণ মানবসম্পদ স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নিচ্ছেন। এর প্রভাব সুভাষের উপর পড়েছে। এছাড়া ১৯১৭ এর রুশবিপ্লব সমস্ত পৃথিবীকে জাগরিত করেছে, নিপীড়িত মানুষের কাছে এই উত্থান প্রেরনা দিয়েছিল। সুভাষ সমেত তাঁর প্রজন্মের সমস্ত নেতাদের মার্ক্সবাদকে ব্রিটিশরা ভয় পেত কারন সমস্ত স্বেচ্ছাচারের স্তম্ভ ভেঙে পড়েছে। গান্ধী এবং সুভাষের প্রভেদ শুধু দুই মানুষের প্রভেদ নয়, দুটি প্রজন্মের প্রভেদ, দুটি বাস্তব পরিস্থিতি এবং দুনিয়া জোড়া অন্তনীহিত ভাবের প্রভেদ।

গান্ধী চিরায়ত ভাবধারায় চালিত আর সুভাষ নবীন ভাবধারায় প্রভাবিত। এছাড়া গান্ধী ছিলেন গুজরাটের মানুষের উপর জৈন ধর্মের প্রভাব পড়ে ফলে অহিংস এবং সবকিছুকে মেনে নেওয়ার প্রভাব পড়ে গান্ধীর উপর। আর সুভাষ বাঙালীর চিরায়ত মাতৃসাধনার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের

দ্বারা। সুভাষের মধ্যে তাই ছিল বন্ধন, অসহিষ্ণু বাঙালীর মানসিকতা, ছিল না আপোষকামীতা। কিন্তু গান্ধী যেখানেই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন সেখানেই তিনি আপোষ করেছেন, যেমন তিনি থামিয়ে দিয়েছেন অসহযোগ, আইন অমান্য আন্দোলন, রাজনৈতিক নেতা হিসাবে সুভাষের মধ্যে গান্ধীর মত সহিষ্ণুতার অভাব রয়েছে।

গান্ধী এবং সুভাষের মধ্যে শিক্ষা, জীবিকাপরিস্থিতি এবং দৃষ্টিকোনেরও বিশাল পার্থক্য ছিল। ১৯২১ সালে সুভাষ আই.সি.এস ত্যাগ করে ভারতে আসেন এবং ১৯৪১ এ ভারত ত্যাগ করেন। এই দীর্ঘ ২০ বছর সময়ের মধ্যে প্রায় ১০ বছর তিনি হয় জেলে, না হয় দেশের বাইরে ছিলেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে বাইরে, সুভাষের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নেন মাত্র ১০ বছর এবং এই অল্পসময়ের মধ্যে তিনি কংগ্রেসের রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন যে তাকে দেশ নায়ক বা নেতাজী হিসাবে ভূষিত হয়েছেন। এই ১০ বছরের মধ্যে দুবার কংগ্রেসের সভাপতি হন ১৯৩৮-১৯৩৯ হরিপুরা ও ত্রিপুরী। এই সময় তিনি শ্রমিক আন্দোলনেও অংশ নিচ্ছেন এবং ভারতীয় অর্থনীতির পরিকল্পনা তৈরী করেন। তাঁর বড় অসুবিধা ছিল নিজেকে সংযত রাখতে না পারা। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সবচেয়ে বড় সমালোচকও স্বীকার করেন যে, তাঁর কথায় ও কাজে কোন ফারাক ছিল না।

১৯২১ সালে সুভাষ আই.সি.এস ছেড়ে ভারতে এসে বোম্বেতে পৌঁছান। তিনি বিলেত থেকে জাহাজে ফেরেন তাতে রবীন্দ্রনাথও ফেরেন। এই সময় গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। সুভাষ বোম্বেতে নামার কয়েকদিনের মধ্যে তিনি গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে দেখা করেন। সুভাষ কলকাতায় অসহযোগ আন্দোলন সফল করার দায়িত্ব নেন। এই আন্দোলনের নীতিগুলিকে সুভাষ মনেপ্রানে মেনে না নিলেও আন্দোলনকে সফল করতে সচেষ্ট হন। চৌরাচৌরীর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে সুভাষ ও চিত্তরঞ্জন দাস প্রবলভাবে সমালোচনা। গান্ধী মনে করতেন নতুন জনজাগরণের ডাক দেওয়ার সময় এখনও আসেনি এবং কংগ্রেসের ভীত সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু সুভাষ গান্ধীর এযুক্তি মেনে নেন নি। এটি ছিল গান্ধীর সঙ্গে সুভাষের বিবাদের দ্বিতীয় পর্যায়।

তৃতীয় পর্যায় হল আইন অমান্য আন্দোলন থেকে সরে এলে সুভাষ ও বিটলভাই প্যাটেল গান্ধীর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানান। ইতিমধ্যে সুভাষ ও জওহরলালের পিতার মৃত্যু ঘটে এবং জওহরলাল গান্ধীর কাছ থেকে আর সুভাষ রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে পিতার স্নেহ পেলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০-এর দশকে অনুভব করেন সুভাষ সমস্ত

অর্থে কংগ্রেসের বাঙালী সমাজের নেতা হতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করলেন সুভাষের মাধ্যমে সৃজনশীল পরিকল্পনা রয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য এবং বিকল্প নেই।

এই সময় থেকে গান্ধী-সুভাষের বিরোধীর চতুর্থ পর্যায় শুরু হয়। সুভাষ গান্ধীর ব্রিটিশ সরকারকে চরমপত্র দেওয়ার কথা বলেন কিন্তু গান্ধী কোন সদুত্তর দেন নি। ১৯৩৯-এ ত্রিপুরীতে সুভাষের কংগ্রেসে সভাপতি পদের মনোনয়নের বিরোধিতা করেন গান্ধী। এর মাধ্যমে চূড়ান্ত সুভাষ বিরোধিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। জয়ের পরও সুভাষ গান্ধীর কাছ থেকে অসহযোগিতাই পেয়েছিলেন এবং কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন এবং সুভাষ ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করেন। কংগ্রেস থেকে সুভাষকে বহিষ্কার করা হয় এবং সুভাষ বাধ্য হলেন দেশ ছেড়ে বিদেশী শক্তি সাহায্য লাভের জন্য দেশের বাইরে যান। সুভাষ ভেবেছিলেন বহিঃক্ষেত্রে থেকে তিনি যদি আক্রমণ করেন, তাহলে দেশের ভেতরেও সমঅভ্যুত্থান ঘটবে। যদিও, ১৯৪৬-এ নৌ বিদ্রোহ হয় তাহলেও শেষ পর্যন্ত সুভাষের প্রয়াস সফল হয়নি।

শুধু কংগ্রেসের ইতিহাসেই নয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেও গান্ধী-সুভাষ বিচ্ছেদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ঘটনা। কংগ্রেসের পক্ষে সুভাষের পরাজয় ছিল কংগ্রেসে বামপন্থীদের চূড়ান্ত পরাজয় ও পশ্চাৎসরণ। অন্যদিকে, কংগ্রেসে গান্ধীর অবিসংবাদিত প্রাধান্য অক্ষুন্ন রইল। এই ঘটনা প্রমান করলো কংগ্রেসে গান্ধীর কোন বিকল্প নেই। গান্ধী-সুভাষ বিরোধ প্রমান করলো ভারতে বামপন্থীদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল নয়। আবার কংগ্রেসে থাকাকালীন সুভাষ গণআন্দোলনের কথা সোচ্চার বললেও প্রস্তাবিত সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার কোন ক্ষমতাই এককভাবে তাঁর ছিল না। তিনি যদি এই ধরনের কোন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হতেন, তাহলে হয়ত দেশবাসী গান্ধীর আসনে তাকেই বসাতো। তবুও বলা যায় যে, সুভাষচন্দ্র বসু হলেন এমন ব্যক্তি যিনি দেশের বাইরে ও ভিতরে লড়াইয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন এবং যুগপথ নির্মান করেন। ভুলভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে কোন প্রতারনা ছিল না। শেষ পর্যন্ত সুভাষ ছিলেন বাঙালীর শেষ তরুণ নেতা।

অস্পৃশ্যতাঃ গান্ধীজী ও আম্বেদকার

আশিস নস্কর
শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
মহেশতলা কলেজ

ভারতীয় সমাজের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিশিষ্ট হল অস্পৃশ্যতা, যা অন্য কোন দেশে নেই বললেই চলে। সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতের বিভিন্নতাকে সমৃদ্ধ মনে হলেও মননে এক বীভৎসতার চিত্র বর্তমান। জগতের অন্যান্য অঞ্চলে স্তরীভূত সমাজে 'শ্রেনী' বিন্যাসের উপস্থিতি থাকলেও ভারতের ক্ষেত্রে 'অস্পৃশ্যতা' শব্দটি অন্তকাল থেকে যুক্ত ছিল। মূলত, অস্পৃশ্যতার ধারনাটি জাত বা বর্ণভেদের সেইসূত্র ধরেই উঠে আসে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায়। 'অস্পৃশ্য' শব্দের সাধারন অর্থ অচ্ছুত, অশুচি; ভারতীয় জাতব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে অস্পৃশ্য বলতে যাকে ছোঁয়া, এমনকি উপস্থিতিও নিষিদ্ধ, মোটকথায় সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে একঘরে করার প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

ভারতীয় পিরামিড-সাদৃশ জাতব্যবস্থায় বহিষ্কারের, অনুকরণের মাধ্যমে এই প্রান্তবাসীদের স্থান দেওয়া হয়েছে সমাজের নিচুতলায়। ভারতীয় ক্রমোচ্চ স্তরীভূত সমাজব্যবস্থায় একটি সামাজিক পিরামিডের ন্যায় জাতকাঠামো আছে, আবার প্রত্যেক জাতকাঠামোতে অসংখ্য পিরামিড ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায় এবং যেগুলির মধ্যে উলম্বী ও আনুভূমিক সচলতা দেখা যায়। হিন্দু জাতকাঠামোতে এই প্রান্তবাসীরা দাস ,দস্যু, রাক্ষস, অসুর, অবর্ণ, নিষাদ, পঞ্চমা, চন্ডাল, হরিজন ইত্যাদি নামে সামাজিক ও আর্থিকভিত্তিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিহিত করা হয়েছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আবির্ভাবের সাথেই এই ব্যবস্থা যুক্ত হয়ে পরেছিল। এই ব্যবস্থার মতাদর্শ ব্রাহ্মন্যবাদ, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ট নিম্নবর্ণকে শাসন ও সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে শুধুমাত্র শ্রমে নিযুক্ত করানো হত না, পাশাপাশি তাকে নিষ্ক্রিয় ও জীবন-সম্পর্কে উদাসীন করে তোলা হয়। এই প্রান্তিক শ্রেনীর নিম্নবর্ণ হয়ে থাকা এবং পীড়িত হওয়াই ছিল ঐতিহাসিক নিয়তি, এটা তাদেরকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করানো হত।

অস্পৃশ্যতার সমস্যা ভারতীয় সমাজে বহুকাল ধরেই বিদ্যমান, কিন্তু জাতীয় রাজনীতির আঙ্গিনায় এই প্রান্তিক শ্রেনীর সমস্যাগুলিকে তুলে ধরেন ঘটে ডঃ বি আর আম্বেদকার। এই জাতিভেদ ব্যবস্থার চর্চাটি মূলত দুটি (জাতীয়তাবাদী ও দলিত) দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে অস্পৃশ্যতার বিষয়টি জাতীয় রাজনীতিতে আলোচিত হয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর হাত ধরে এবং সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি

হিসাবে আম্বেদকার এই প্রান্তিকবর্গের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যতার জায়গাটিকে তুলে ধরেছিলেন। গান্ধীজী অস্পৃশ্যতাকে দেখেছিলেন অভিশাপ হিসাবে। তিনি অস্পৃশ্যতার অবসান চেয়েছিলেন, শুধু তাই নয়, অস্পৃশ্যতা যে সমাজের অগ্রগতিতে বাধা তারও উল্লেখ করেন।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ধারায় গান্ধীর নির্দেশিত কর্মসূচীতে অস্পৃশ্যতার কখনই মুখ্য ছিল না, ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে জাতীয় ধারনার মধ্যে তিনি সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। মুসলিম, শিখ, খ্রিষ্টান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার, প্রতিনিধিত্ব ও স্বতন্ত্রতা নিয়ে গান্ধীর ভাবনাতে থাকলেও অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে নিরব ছিলেন। তাসত্ত্বেও, জাতীয় রাজনীতির স্বার্থে উচ্চবর্গীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে গান্ধী অস্পৃশ্যদের আপন করে নেওয়ার কথা বলেছিলেন। গান্ধী বর্ণব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন, এমনকি চতুর্বর্ণের কার্যপ্রণালীতেও। বর্ণব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই অবদমিত শ্রেনীকে অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক থেকে মুক্তির কথা বলেছেন। গান্ধী চেয়েছিলেন হিন্দু সমাজকে সম্পন্ন করতে। সামাজিক পরাধীনতার গুরুত্বকে স্বীকার না করেই তিনি উচ্চবর্গ ও বর্ণের দ্বারা 'হরিজন' হিসাবে নিম্নবর্ণীয় সম্প্রদায়কে অভিহিত করার কথা বলেন। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি উক্ত সমস্যাটির সমাধান চেয়েছিলেন। তিনি পুরানো সমাজকাঠামোর সংস্কার চেয়েছিলেন মূল ভিতটাকে অটুট রেখে। 'গীতা' থেকে অনুপ্রেরণা পাওয়ার কারনেই গান্ধী বর্ণব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, বর্ণব্যবস্থাকে সমর্থন করে বা নির্মূল না করে কীভাবে অস্পৃশ্যতাকে দূর করা যায়? তাই আম্বেদকার বলেছেন, অস্পৃশ্যতাকে দূর করতে হলে অবশ্যই বর্ণব্যবস্থাকে নিশ্চিহ্ন করতে করা। তথাকথিত ব্রাহ্মন্য ধর্মের মূল ভিত্তি হিসাবে যদি বর্ণভেদ বা জাতভেদ না থাকে, তাহলে অস্পৃশ্যতার প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই অবলুপ্তি হবে।

একদিকে গান্ধী ছিলেন গুজরাটের বেনিয়া বা বনিক সম্পদায়ের মানুষ, ব্রাহ্মনদের অনেক কাছাকাছি হওয়ার কারনে সামাজিক বৈষম্যের শিকার সেভাবে হতে হয়নি, যে বৈষম্যটি আম্বেদকারের সঙ্গে হয়েছিল 'মাহার' সম্প্রদায়ের মানুষ হওয়ার কারনে। ঠিক এই কারনেই বর্ণব্যবস্থাকে গান্ধী সমর্থন এবং আম্বেদকার সেখানে বিলুপ্তির কথা বলেছেন। হরিজন পত্রিকাতে গান্ধী আম্বেদকারের এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গে বলেন - ডঃ আম্বেদকার হিন্দুধর্মের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ। হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহন ও হিন্দুপরিমণ্ডলে শিক্ষালাভ করেও তিনি এই ধর্মের প্রতি বিতশ্রদ্ধ। তথাকথিত সবর্ণ হিন্দুদের কাছ থেকে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার পেয়েছিলেন। সেই তিক্ততা থেকে শুধু সবর্ণ হিন্দুদের নয়, হিন্দুধর্মকে ত্যাগ করতে চেয়েছেন। ধর্মপ্রচারকদের একাংশের বিরুদ্ধে তাঁর মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ শেষপর্যন্ত তাকে

সেই ধর্মের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছেন, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সবর্ণদের আচরণ ও তার পক্ষে সাজানো যুক্তি ও ধর্মশাস্ত্রগুলিতে সেই যুক্তির উল্লেখ। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র আম্বেদকার-ই বিতশ্রদ্ধ হয়েছেন, তেমন নয়। তিনি প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে ব্যতিক্রমীভাবেই বিশিষ্ট এবং এখনও পর্যন্ত ক্ষুদ্র একটি সংখ্যালঘুগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, অনেকে তাকে অবদমিত শ্রেণীগুলির নেতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অথচ এই শেষোক্তরা হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করার হুমকি না দিয়ে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে হরিজনদের প্রতি নিলজ্জ অত্যাচারের শুধু সমাধান চেয়েছেন।

গান্ধী দেখিয়েছেন ধর্মের সাথে বর্ণের কোন সম্পর্ক নেই, এটি একটি প্রথা মাত্র। যার উৎস আমার অজানা এবং তা জানার প্রয়োজন বোধ করেন নি, 'বর্ণ' এবং আশ্রম' হল প্রতিষ্ঠানমাত্র, এর সাথে জাতভেদের কোন সম্পর্ক নেই, পূর্বপুরুষের পেশা অনুযায়ী বর্ণ আমাদের উপার্জন করতে শেখায়, অধিকার নির্দিষ্ট করে না, মানবকল্যাণের পরিপূরক। বর্ণের কাছে সমস্ত কাজের গুরুত্ব রয়েছে ন্যায়সঙ্গত এবং মর্যাদার নিরিখে। আধ্যাত্মিক শিক্ষক হিসাবে ব্রাহ্মণের পেশার মর্যাদা এবং একজন ডোমের পেশার মর্যাদা কোন প্রভেদ নেই বলেই প্রত্যেকেই কর্মফল ভোগ করবে।

আম্বেদকারের উদ্দ্যেশে গান্ধী বলেন – আপনার মতে জাতি ও বর্ণের তত্বগত ধারনা খুবই সূক্ষ্ম এবং সাধারণ মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য নয়। বর্ণব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য অচল ও অদূর ভবিষ্যতে এর ফলপ্রসু হওয়ার সম্ভবনা কম। হিন্দুরা বর্ণভেদ প্রথাকে চিরন্তন হিসেবে মেন নিয়েছে। এইভাবে গান্ধী নিজের প্রস্তাবিত বর্ণকাঠামোর অমরত্বকে ঘোষণা করেন এবং বর্ণপ্রথা বিরোধী যুক্তিগুলিকে নস্যাৎ করার প্রয়াস চালান। এটা লক্ষণীয় যে, সমসাময়িক কালের ২টি রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার দ্বারা গান্ধী পরিচালিত হয়েছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে। প্রথমটি হল ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা এবং দ্বিতীয়টি হল তৎকালীন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের বাধ্যবাধকতা। দ্বিতীয় বাধ্যবাধকতাটির ক্ষেত্রে গান্ধির রাজনৈতিক, সামাজিক চিন্তার শিকড় যে প্রচলিত বর্ণকাঠামোটির বা ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ব্যবস্থার দর্শন ও চিন্তাকেই প্রতিফলিত করেছিল, একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এরই বিপরীতে আম্বেদকার তাঁর নিজস্ব ভাষ্যকে উপস্থিত করেছিলেন, সেদিকে নজর দেওয়া যাক -

(দ্রষ্টব্যঃ আম্বেদকার প্রতি গান্ধির পত্র। হরিজন। ১৬ই ও ১৮ই জুলাই, ১৯৩৬)

'Annihilation of Caste' গ্রন্থে আম্বেদকার জাতব্যবস্থার সম্পূর্ণরূপে বিনাশ চেয়েছেন। আম্বেদকার দেখিয়েছেন হিন্দুধর্মে জাতের ভিত্তিতে মানুষকে শ্রেনী বিভক্ত করা হয়, যেখানে বৈষম্য চূড়ান্ত, যেখানে অর্জনের পরিবর্তে ব্যক্তির মর্যাদা জন্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়। আম্বেদকার উচ্চবর্ণের মানুষদের নিম্নবর্ণের প্রতি উদার মানসিকতার পরিচয় - এই ধারনার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেন - প্রকৃতিগত ভাবে যিনি বর্ণবিদ্বেষী, তাঁর চরিত্রের সংশোধন ঘটানো অসম্ভব, যেমন – *"যুদ্ধ ব্যবসায়ী, অথচ তার বিক্রি করা গোলা-বারুদ ফাটবে না"।* যে সমাজ জাতি ও বর্ণের বৈষম্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, তা মানুষের মধ্যে ভেদাভেদের জন্ম দেবেই।

খ্রীষ্টান ধর্মযাজক হতে গেলে তাকে, ধর্মযাজক হওয়ার পরীক্ষার পাস করতে হয়। যে কোন খ্রিষ্টান ধর্মবলম্বী মানুষ এইভাবে পাদ্রি, রেভারেন্ড, ফাদার-এর পর্যায়ে উপনীত হতে পারেন, কিন্তু হিন্দুধর্মে সেই সুযোগের স্থান নেই। অস্পৃশ্য ব্যক্তি পূজা করতে পারবে না সংস্কৃতে পণ্ডিত হতে পারবে না। আম্বেদকার তাই বলেছেন, জাতিধর্মের অপসারণ, হিন্দুধর্মের অপসারণ। আর সেইজন্যেই তিনি তিনটি ধর্মের কথা ভেবেছিলেন – শিখ, ইসলাম ও বৌদ্ধ। তিনি ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে মৃত্যুর কয়েক মাস আগে বৌদ্ধধর্ম গ্রহন করেন। নিম্নবর্ণের মানুষদের কাছে আম্বেদকারের জীবন ও সংগ্রাম এখনও একটা শিক্ষা এবং উচ্চবর্ণীয় বর্ণহিন্দুদের কাছে তিনি এক প্রকার ভীতি।

.....

বর্ণ, বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতা বিষয়ে গান্ধি

ডঃ কৃষ্ণ কুমার সরকার
গবেষক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধি (১৮৬৯-১৯৪৮) একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর কর্মকান্ড দেশের সীমানা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিকস্তরে উন্নীত হয়ে আছে। মূলত বিদ্যায়তনিক গবেষক ও গান্ধিবাদী গবেষকদের হাত ধরেই তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে পড়েছে জগৎময়। ফলত তিনি সকলের কাছে পরিজ্ঞাত হয়ে আছেন 'জাতির পিতা' তথা 'মহাত্মা' হিসেবে। কিন্তু এই মহাত্মার কর্মকাণ্ডের মধ্যেও নানা বিষয়ে দ্বান্দ্বিক অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিজীবনে তিনি অহিংসার পূজারী হলেও তাঁর প্রদর্শিত আন্দোলনগুলির মধ্যে 'হিংসা' ও 'অহিংসা'র সংমিশ্রণ দেখা যায়। ভারতের রাজনীতিতে তাঁর উত্থানকে ঘিরে একদিকে যেমন নানা মিথের অবতারণা ছিল, অন্যদিকে বিভিন্ন আন্দোলনে তাঁর সফলতার মূল চাবিকাঠি ছিল 'উপ-ঠিকাদারদের' হাতেই। (জুডিথ ব্রাউন, গান্ধি'স্ রাইস টু পাওয়ার, কেমব্রিজ: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭২)। এতদসত্ত্বেও ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধির আগমন ও কার্যকলাপ ভারতীয় রাজনীতিতে একটি নতুন পথের সূচনা করে। তিনি জনজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়ে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রদান করেন। এই সময় সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা, অস্পৃশ্য, অবদমিত, নিম্নবর্ণীয় শ্রেণীগুলির প্রতি সহানুভূতি(!)বশত তাঁদের মর্যাদা দেওয়ার জন্য তিনি 'হরিজন' হিসাবে তাঁদেরকে সঙ্গায়িত করেন। (হরিজন শব্দটি প্রথম পণ্ডিত নর সিং মেহতা ব্যবহার করেন। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সুজিত সেন (সম্পা.), জাতপাত ও জাতি: ভারতীয় প্রেক্ষাপট, কলকাতা: নবপত্র, ২০০৩, পৃ. ৩১১)।

বর্ণ ও বর্ণাশ্রম বিষয়ে গান্ধিজি

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা পুরুষ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। 'সকলকে' নিয়ে আন্দোলন করাই ছিল গান্ধির রাজনীতির অভিনব কৌশল। (শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, *পলাশি থেকে পার্টিশান,* হায়দ্রাবাদ: ওরিয়েন্ট লংম্যান, ২০০৬, পৃ.৩৪৪। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন-D. Dalton, *Mahatma Gandhi: Non Violent Power in Action,* New York: Columbia University Press, 1993, পৃ. ২১)। এই কারণে অচিরেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন জনগণের 'নেতা'। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে গান্ধিজি তাই ভারতের

রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। এই সময় তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিশেষত *'হরিজন'*, *'ইয়ং ইন্ডিয়া'*তে সামাজিক সমস্যা বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন, যেগুলি থেকে বর্ণ, বর্ণাশ্রম ও অস্পৃশ্যতা বিষয়ে তাঁর অভিমত জানা যায়। গান্ধি বর্ণব্যবস্থাকে ভারতীয় জাতির 'ভিত্তিপ্রস্তর' বলে মনে করতেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা বর্ণব্যবস্থাকে দুর্বল করার চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, বর্ণব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ভারতীয় জাতিগঠন কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তবে তিনি বর্ণব্যবস্থার যে ব্যাপক 'সামাজিক এবং ধর্মীয় সংস্কার' দরকার সেকথা মনে করতেন। অর্থাৎ, বর্ণব্যবস্থার কুফলগুলোকে যদি সংস্কারের মাধ্যমে দূর না করা যায়, তাহলে অনতিবিলম্বেই ভারতীয় জাতির ভিত দুর্বল হয়ে পড়বে। সংস্কারের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে গান্ধি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কথা বলেছেন। তিনি কখনোই সনাতন বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে অস্পৃশ্যতার যে কোন অনিবার্য সম্পর্ক থাকতে পারে—একথা মানতেন না। বর্ণব্যবস্থা যদি বৃক্ষ হয়, অস্পৃশ্যতা তবে পরগাছার মতো। পরগাছাকে কাটতে গিয়ে আমরা যেন ভুল করে বৃক্ষ না কেটে বসি। বর্ণহিন্দুদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় তাঁর মনে হয়েছিল, বর্ণব্যবস্থা ধ্বংস করার অর্থ হল –বর্ণ এবং অবর্ণের মধ্যে একটা 'রাজনৈতিক বিভাজন' সৃষ্টি করা। গান্ধি মনে করতেন, এধরণের 'রাজনৈতিক বিভাজন' ভারতীয় জাতিগঠনের পক্ষে 'আত্মঘাতী' হতে বাধ্য। (সত্যব্রত চক্রবর্তী (সম্পা.), *ভারতবর্ষ: রাষ্ট্রভাবনা*, কলকাতা: প্রকাশন একুশে, ২০০১, পৃ. ৩১৯)। গান্ধিজি জানিয়েছেন-

> "পরিবার সম্ভবত ঈশ্বর সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। একটি পরিবারে যেমন থাকে সেই রকম ঐক্য বা স্বাভাবিকতা জাতিপ্রথা বা শ্রেণীপ্রথা কোনটিতেই নেই। জাতিপ্রথা যদি বেশ কিছু অকল্যাণ ঘটিয়ে থাকে তাহলে শ্রেণীপ্রথাও কম কিছু ঘটায়নি। শ্রেণীপ্রথা যদি কিছু সামাজিক উৎকর্ষতার সংরক্ষণে সাহায্য করে থাকে তাহলে জাতিপ্রথাও একই কাজ সমানভাবে করেছে, হয়ত-বা কিঞ্চিৎ বেশিই করেছে। জাতিপ্রথার ভাল দিকটি হল এই সম্পত্তির মালিকানার পার্থক্যের উপর নির্ভর করে না। ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে পৃথিবীতে অর্থই সব থেকে বেশি বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তি। এমনকি পবিত্র পারিবারিক বন্ধনও সম্পদের দূষণ থেকে নিরাপদ নয়---একথা বলেছেন শঙ্করাচার্য। পরিবারেরই বৃহত্তর রূপ হচ্ছে জাতি। উভয়ই রক্তের সম্পর্ক তথা উত্তরাধিকার দ্বারা পরিচালিত হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে উত্তরাধিকার হচ্ছে একটি মায়া, আসলে পারিপার্শ্বিক অবস্থাই হচ্ছে সব। বহু দেশের বহু জোরাল অভিজ্ঞতাই এই সমস্ত বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবুও যদি তাঁদের 'পারিপার্শ্বিক অবস্থা' মতবাদ মেনেও নিই

তাহলেও এটা প্রমাণ করা সহজ যে শ্রেণীপ্রথা অপেক্ষা জাতিপ্রথার মাধ্যমে 'পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে' অনেক বেশি সংরক্ষিত ও বিকশিত করা যায়।" (শ্রীমান নারায়ণ (সম্পা.), *মহাত্মাগান্ধির নির্বাচিত রচনা, পঞ্চম খন্ড[সত্যের আহ্বান]*, আমেদাবাদ: নবজীবন পাবলিশিং হাউস, ২০০০, পৃ. ৪০৮। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন--*ইয়ং ইণ্ডিয়া*, ২৯.১২.১৯২০, পৃ. ২)।

আবার তিনি জাতিভেদের সঙ্গে বর্ণপ্রথার কোন সম্পর্ক নেই বলে বক্তব্য রেখেছেন। সদর্পে তিনি জানিয়েছেন-

> "বর্ণের ছদ্মবেশধারী জাতপাতের রাক্ষস অধঃপাতে যাক। জাতিভেদের দ্বারা বর্ণের হাস্যকর অনুকরণ হিন্দুধর্ম তথা ভারতবর্ষকে অধঃপতিত করেছে। বর্ণাশ্রম অনুসরণ করায় আমাদের ব্যর্থতাই বহুলাংশে আমাদের অর্থনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সর্বনাশের কারণ। এটি আমাদের কর্মহীনতা এবং দারিদ্রের অন্যতম কারণ, এবং অস্পৃশ্যতা ও আমাদের বিশ্বাসহীনতার জন্যও এটি দায়ী।" (*ইয়ং ইণ্ডিয়া*, ২৪.১১.১৯২৭, পৃ. ৩৯০)।

গান্ধিজি মনে করতেন বর্ণ মানুষের জন্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে, বা অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। এই বিধি পালনের অর্থ হল পূর্বপুরুষদের বংশধারা ও ঐতিহ্যের আহ্বানকে স্বীকার করে 'বর্ণাশ্রমের' মূল ভাবটিকে বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করা। বর্ণাশ্রম প্রথায় বংশানুক্রমিক কাজকে দায়িত্ব মনে করা হয়। স্বভাবতই সেই কাজের দ্বারা তাঁর জীবিকা নির্বাহও হয়ে থাকে। এই অনুযায়ী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেন। গান্ধিজি জানিয়েছেন-

> "বর্ণ জন্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়, কিন্তু তাকে বজায় রাখা যায় শুধু নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের দ্বারা। .....বর্ণ মানুষের সত্তার পরিচয় প্রদান করে এবং সেই পরিচয়ের সুবাদে তাঁর পালনীয় দায়িত্বের উল্লেখ করে কিন্তু কেউও উঁচু বা কেউও নীচু এই ভাবনা বা অধিকার প্রকাশ করে না, বরং তার বিরোধিতা করে। সকল বর্ণের মানুষই সমান, কারণ সমাজ কারও উপর বেশী বা কারও উপর কম নির্ভর করে না। আধুনিক কালে বর্ণের অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে উচু-নীচুর শ্রেণীবিভাগ। বর্ণের বিধি আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষেরা কঠোর নিয়ম-সংযমের দ্বারা আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের সর্বোত্তম যোগ্যতা দ্বারা আমাদের এই বিধি মেনে জীবন-যাপনই করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ..... যদিও ' বর্ণবিধি' কিছু হিন্দু দার্শনিকের বিশেষ আবিষ্কার,

তাহলেও এর বিশ্বজনীন প্রয়োগ রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মেরই কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে কিন্তু সেই ধর্ম যদি কোন বিধি বা আদর্শকে প্রকাশ করে তাহলে সেটির বিশ্বজনীন প্রয়োগযোগ্যতা থাকা দরকার। 'বর্ণ' বিধিকে আমি সেই দৃষ্টিতেই দেখি। আজ হয়ত সারা জগৎ এটিকে অগ্রাহ্য করতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে এটিকে গ্রহণ করতেই হবে।বেদে চারটি 'বর্ণ'কে শরীরের চারটি অঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং এর থেকে ভাল তুলনা আর হয় না। তাঁরা যদি একই শরীরের সদস্য (অঙ্গ) হয় তাহলে কেউ কারও থেকে উঁচু বা নীচু হয় কি করে? দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির যদি ভাব-প্রকাশের ক্ষমতা থাকত এবং তারা প্রত্যেকেই যদি বলতে শুরু করত যে সে বাকি অঙ্গদের তুলনায় উচ্চতর এবং শ্রেষ্ঠতর তাহলে আমাদের দেহটাই টুকরো টুকরো হয়ে যাবে যদি উৎকৃষ্টতা-নিকৃষ্টতা বিচারের মত দুষ্ট ক্ষতকে জিইয়ে রাখা হয়। এই দুই ক্ষতই আমাদের বর্তমান সময়ের বহু অকল্যাণের মূল, বিশেষত জাতের লড়াই এবং গৃহযুদ্ধ। খুব সামান্য বুদ্ধিতেও এটা বোঝা দুষ্কর নয় যে 'বর্ণাশ্রম' ধর্ম পালন বিনা এইসব যুদ্ধ বিবাদের অবসান ঘটানো যাবে, তার কারণ বর্ণাশ্রমের নির্দেশই হচ্ছে –একজন যে উদ্দেশ্যে জন্মেছে তার সেই অস্তিত্বের শর্তকে সে পূরণ করবে সেবা ও কর্তব্যের মানসিকতা নিয়ে (অর্থাৎ সে যে 'বর্ণে' জন্মেছে সেই বর্ণের জন্য নির্দিষ্ট দায়িত্ব সে পালন করবে সেবার মনোভাব নিয়ে।)" (*হরিজন,* ২৮.০৯.১৯৩৪, পৃ. পৃ. ২৬০-৬২)।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও অস্পৃশ্যতা বর্জনে গান্ধিজি

১৯৩০খ্রিঃ যারবেদা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী থাকার সময় গান্ধিজি সত্যাগ্রহ আশ্রমে প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখতেন। পরবর্তীকালে ১৯৩২ এ *"যারবেদা মন্দির থেকে"* শিরোনামে এখানে ১৬টি বিষয় প্রকাশিত হয়। যার মধ্যে 'অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ' ছিল অন্যতম একটি।এখানে গান্ধিজি জানিয়েছেন-কেউ জন্মসূত্রে অস্পৃশ্য হতে পারে না। কারণ সবাই এক ও অদ্বিতীয় অগ্নির স্ফুলিঙ্গ। কোন কোন মানুষকে জন্মাবধি অস্পৃশ্য বিবেচনা করা অন্যায়। কোন মৃতদেহকে স্পর্শ করার ব্যাপারে মিথ্যা আচার-বিচার পালন করাও অনুচিত। শবদেহ তো করুণা ও শ্রদ্ধার জিনিস। একমাত্র স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে আমরা মৃতদেহ স্পর্শ করার পর স্নান করি। ঐ একই কারণে তৈল মর্দন বা ক্ষৌর কর্মের শেষে স্নান করে থাকি। ঐসব কাজের পর যে মানুষ স্নান করে না, তাকে নোংরা মনে করা যেতে পারে কিন্তু অপবিত্র নিশ্চয় নয়। সন্তানের মল-মূত্র পরিষ্কার করার পর মা যতক্ষণ স্নান না করছেন, ততক্ষণ 'অস্পৃশ্য'

হতে পারেন। কিন্তু সেই সময়ে কোন শিশু যদি তাঁকে স্পর্শ করে ফেলে, তবে সে দূষিত হয়ে যেতে পারে না।অথচ ভাংগী, ধাংগর ও চামার প্রমুখদের জন্ম থেকেই উপেক্ষা ভরে অস্পৃশ্য জ্ঞান করা হয়। বছর বছর ধরে তাঁরা অনেক সাবান মেখে স্নান করতে পারেন, ভাল পোষাক পরতে পারেন, বৈষ্ণবদের ফোঁটা-তিলক ছাপ লাগাতে পারেন, প্রত্যহ গীতাপাঠ করতে পারেন এবং শিক্ষিতের পেষায় নিযুক্ত থাকতে পারেন, কিন্তু তবুও তাঁদের অস্পৃশ্যতার ছাপ ঘুঁচবে না। এ হল চূড়ান্ত অধার্মিকতার লক্ষণ, যার ধ্বংসই একমাত্র কাম্য। এপ্রসঙ্গে গান্ধিজি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন-

> ‘‘অস্পৃশ্যতা দূরীকরণকে আশ্রমের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে আমরা আমাদের বিশ্বাসকে সর্বজন সমক্ষে প্রকাশ করতে চাই যে অস্পৃশ্যতা কেবল হিন্দুধর্মের কোন রকম অঙ্গই নয়, বরং এ এক প্লেগ ব্যাধি, যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা প্রতিটি হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য। তাই প্রতিটি হিন্দু যাঁরা এই প্রথাকে পাপ বিবেচনা করেন তাঁরা তথাকথিত অস্পৃশ্যদের সঙ্গে সহজে মিত্রতা বন্ধন গড়ে তুলে এর প্রায়শ্চিত্ত করবেন। তাঁদের সঙ্গে সেবা ও প্রেমভাবনা চালিত হয়ে মেলা–মেশা করবেন। এই ভাবে এই পাপ প্রথার বিরোধী হিন্দুরা নিজেদের শুদ্ধিকরণ হচ্ছে মনে করবেন। তথাকথিত অস্পৃশ্যদের যুগ যুগের দাসত্বের কারণ সঞ্জাত অজ্ঞানপুঞ্জ ও অন্যান্য দোষত্রুটি থেকে মুক্তি দেবার জন্য এবং তাঁদের অভাব-অভিযোগ মেটাবার জন্য ঐ জাতীয় হিন্দুরা ধৈর্য্য ধরে চেষ্টা করবেন। এইভাবে তাঁরা অন্য হিন্দুদেরও অনুরূপ আচরণের জন্য অনুপ্রাণিত করবেন।’’[৯]
> (শ্রীমান নারায়ণ (সম্পা.), *মহাত্মাগান্ধির নির্বাচিত রচনা, তৃতীয় খন্ড[মৌলিক রচনা সমূহ]*, আমেদাবাদ: নবজীবন পাবলিশিং হাউস, ২০০০, পৃ. ১৮২। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন মহাত্মা গান্ধি, *যারবেদা মন্দির থেকে*, যারবেদ কেন্দ্রীয় কারাগার, ১৯৩২)।

অস্পৃশ্যতা বর্জন বিষয়েও গান্ধিজি জানিয়েছেন-

> ‘‘অনেক কংগ্রেসী এই ব্যপারকে নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টি হইতে আবশ্যক বস্তু বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং ইহা যে হিন্দুদের পক্ষে হিন্দু ধর্ম রক্ষার জন্য একান্ত অপরিহার্য এই ধারণা অনেকে রাখেন না। যদি হিন্দু কংগ্রেসীরা অস্পৃশ্যতা বর্জন উহার নিজস্ব আবশ্যকতার জন্যই মানেন, তবে তাহার তথাকথিত ‘ সনাতনী’দিগকে আজকের অপেক্ষা অনেক বেশী প্রভাবিত করিতে পারিবেন। তাঁহারা এই বিষয়টা সনাতনীদের সহিত লড়াই করার বিষয় বলিয়া না লইয়া,

অহিংসকের পক্ষে যা ভাব হওয়া উচিত –বন্ধুত্বের ভাব লইয়াই যেন গ্রহণ করেন। আর হরিজনদের সম্পর্কেও ইহাই আবশ্যক যে, প্রত্যেক হিন্দু তাহাদের সমস্যাকে নিজ সমস্যা বলিয়া মনে করিবেন—তাহাদের ভীষণ একাকীত্বের মধ্যে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব রাখিবেন। হরিজনদের যে একাকীত্ব, দুনিয়ায় তাহার সহিত এত বড় নিদারুণ একাকীত্ব আর দেখা যায় না। আমি অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, এই কাজ করা কত কঠিন। কিন্তু স্বরাজের সৌধ নির্মাণ করিতে হইলে এই কাজ অবশ্য করণীয়। স্বরাজের পথ ত দুর্গম ও সঙ্কীর্ণ। এই পথে অনেক পিচ্ছিল চড়াই ও গভীর খাদ আছে। দৃঢ়পদে এই সকল সঙ্কট পার হইতে হইবে, তবে না আমরা স্বরাজশীর্ষে পৌঁছাইতে পারিব ও সেইখানকার স্বাধীনতার নির্মল বায়ুতে শ্বাস লইতে পারিব।" (মহাত্মা গান্ধি, *গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি-এর অর্থ ও স্থান*, পুনা, ১৯৪৫)।

পর্যবেক্ষণ

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় গান্ধি অহিংসা ও সত্যের সাধনার পাশাপাশি জনগণের মধ্যে ভেদাভেদ দূরীকরণের চেষ্টায় সদা ব্যপৃত ছিলেন। তিনি অস্পৃশ্যতার সমস্যাকে সামাজিক বিষয় হিসাবেই গণ্য করতেন। তবে তিনি পুরোপুরি জাতিপ্রথার ধ্বংস চাননি। চেয়েছিলেন বর্ণকাঠামোকে অক্ষুণ্ন রেখে কিছু সংস্কার, যাতে তাঁর 'অস্পৃশ্য/ হরিজন'দের বর্ণ হিন্দুরা ঘৃণা না করে। এককথায় গান্ধিজি নিম্নবর্ণীয়দের সামাজিক মুক্তির জন্য তাঁদেরকে 'হরিজন' অভিধায় অভিহিত করে 'হরিজন আন্দোলন' শুরু করেছিলেন। এর মধ্যে তিনি তাঁদের মানবিক মুক্তির প্রয়াসও চেয়েছিলেন। তবে এবিষয়ে গান্ধিজি কোন স্থায়ী সমাধান সূত্রের সন্ধান দেননি বলা যায়। বর্তমানে অনেক গান্ধি সমালোচক হরিজন আন্দোলনে গান্ধিজির ভূমিকাকে তির্যকভাবে দেখেন। এ প্রসঙ্গে গবেষক শুভঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য-

"অস্পৃশ্যতার প্রশ্নে মহাত্মাজী যে আন্দোলন শুরু করেন তাও তাঁর সামগ্রিক রাজনৈতিক দর্শনের সঙ্গে যুক্ত, ধর্মপ্রাণ গান্ধির অহিংসার নীতি 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, 'স্বরাজ' এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা নিয়ে টালবাহানা, শত্রুর ক্ষতি না করে তার হৃদয় পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা, মালিক-শ্রমিকের পিতা-পুত্র প্রতিম সম্পর্ক স্থাপনের প্রচার ইত্যাদির মতোই গান্ধি নির্দেশিত বর্ণ হিন্দু 'হরিজন' দ্বন্দ্বের সমাধানের পথ একান্তভাবেই মহাত্মাসুলভ বর্ণাশ্রম বজায় রেখে। যাবতীয় হিন্দু ধর্মগ্রন্থকে মান্য করে, গীতার মাহাত্ম্য প্রচার করে মহাত্মাজী 'হরিজন' আন্দোলন শুরু করেছিলেন। হিন্দু –মুসলমান প্রশ্নেও গান্ধি ব্যর্থ আর একইভাবে অস্পৃশ্যতা বিরোধী

আন্দোলনেও তিনি ব্যর্থ।" (সুকান্তপাল (সম্পা.), *বহুমাত্রিকতার আলোকে ভীমরাও আম্বেদকর*, কলকাতা: মিত্রম, ২০১৭, পৃ.২০৯)।

.....

The Philosophical thought of Mahatma Gandhi

Juyel Ali

Teacher, Department of Education,
Maheshtala College

The main function of education is to create an ideal citizen. In spite of other preoccupations- political, social, economic and religious, Mahatma Gandhi's interest in education had always been profound. According to Gandhiji, education meant the enjoinment of the best human attributes: the connection of the mind, the body and the spirit. He believed that "genuine education does not consist of" cramming a lot of information and numbers in mind. Nor it lies in passing the examination by reading several books, but it lies in developing character. It is a real education with inculcates internal virtues (values) in human beings. If you can develop such virtues, it will be the best education. He claimed that self-realisation was the ultimate goal of education.

In the present scenario of education, it is an anomaly that education has not been able to give the right direction to our youth and it does not provide those opportunities for their all-round development. In his article titled the 'New Education' published in 'Youth India' on 1st September 1971, Mahatma Gandhi had written that whatever may be true in other countries, in India where more than 80% of the population is occupied with agriculture and another 10% occupied in industries, it is a crime to make education merely literary, and unfit for the boys and girls.

Gandhiji observed that the system of education in India during the time of the British reign was wasteful and positively harmful. It was believed by Mahatma that foreign medium of instruction made our children practically foreigners in their own land. The English language had also prevented the growth of the vernacular languages of India.

Basic education was Gandhiji's most significant contribution to education. In South Africa, he used to teach his children with other students and illiterate in the Tolstoy farm of the transversal. His long experiment in the field of education helped him to devise a new scheme of education suitable for his own country. In 1993 Gandhiji explored a new system of education, which he called basic education. It is also known as 'Nai Talim'. It is a principle

promoted by Gandhiji. It said that knowledge and work are not separate. It was popularly described education through handicrafts. NaiTalim was conceived as a 'craft-based' education in which practical skills servers as the foundation of an individual's spiritual, cultural and social development. It is a philosophy of learning and living.

The term 'Basic' comes from 'base'. In a literary sense, basic education is the foundation or education at the primary level on which the edifice of the superstructure of higher education can be limit. The scheme of basic education was put forward at the 1st All India National Education conference convinced at Wardha on 22nd and 23rd October 1937. Gandhi takes education from a broad perspective and beings forth its two basic objectives acquisition of knowledge and a sense of freedom. According to him, education is the realisation of the best in man-body, soul and spirit. Education must be based on ethics and morality.

Gandhiji's basic education was to protest against the education that prevailed during the time of the British rule in India. It was fully realised by Gandhiji that the British system of education was harmful and artificial. He did not like a system which is too much literal and bookish. His basic scheme of education was to protest against an urban system of education in rural areas and the present single-track system of education.

Basic education is based on learning by doing and child centre education. Another utility of basic education is self-supporting and self-sufficiency. Basic education aims to develop all-round physical, mental and spiritual development and make the student reliant. It helps to develop ideas of mutual understanding and a habit of cooperative and mutually helpful living among the students. It emphasises manual work.

The detailed scheme of basic education curriculum was prepared by Dr.Jakir Hussain. All over India, basic education scheme was accepted as a national system of education after independence. There are five schematic patterns of education:

1. Pre-basic (up to 6th years)
2. Basic (from 7 to 14 years)
3. Post -basic (from 15 to 18 years)
4. University education
5. Social and Adult Education.

The principles of basic education: there should be free, basic and universal education with the age group 7 to 14.

The mother tongue, or vernacular, should be the medium of instruction in an educational institution.

Human values should be developed in the child, and not just the knowledge of the English language.

Education should achieve the harmonious development of the child's body, mind and soul. It should be imparted through some productive craft or industry, and useful correlation should be established with that industry.

The child should achieve gainful work experience through practical work. School should be a place of activity where the child gets busy in various experiments and gains newer and newer experience bringing forth researches. It should create useful responsible and dynamic citizens.

Through such activity-based education, students will learn with joy, and acquire literary knowledge as well as moral physical and mental development.

.....

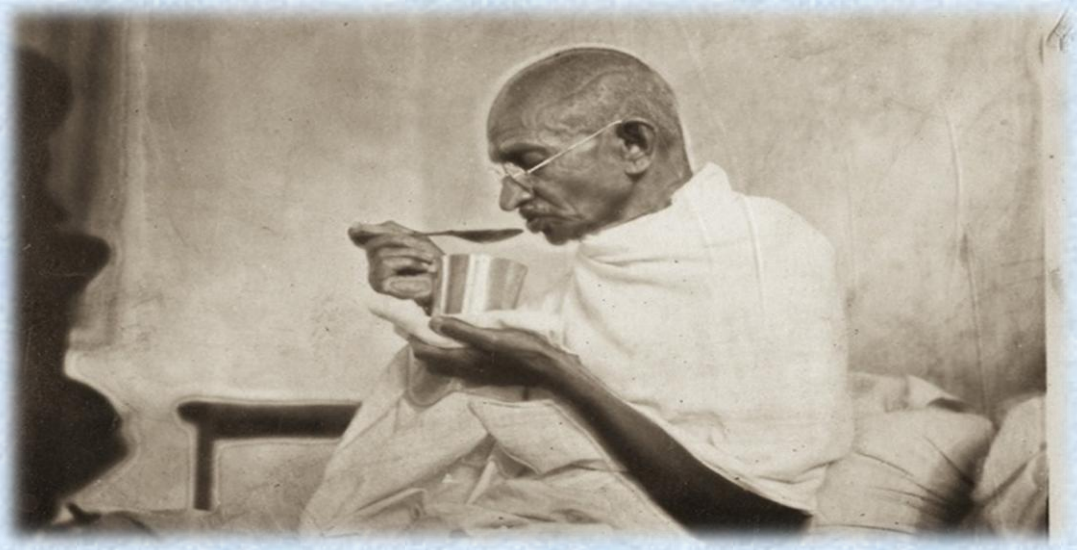

সত্যাগ্রহঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

কিশোর রায় সরকার

শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ,
মহেশতলা কলেজ

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ‘ মহাত্মা’ হয়ে উঠেছেন তাঁর জীবনশৈলী, কর্মপন্থা, ও চিরন্তন দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারা মানবকল্যাণকর পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। আসলে, সমাজের সুচিন্তক মানবগোষ্ঠীর কাছে ‘গান্ধী’ শব্দটি শুধুমাত্র আবেগ নয়, কর্মচিন্তা ও পদ্ধতির প্রেরনার সঞ্চারকের ভূমিকা পালন করে। জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীর ভূমিকা নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মতামত আছে, থাকবেই। কিন্তু, ভারতীয় সমাজে বা বিশ্বজনীন সমাজের গান্ধীর এই কর্মপন্থার গুরুত্ব হাড়েহাড়ে টের পাওয়া যায় বর্তমানের সহিংস ঘটনাগুলির বিরোধিতায় শান্তিকামীদের কণ্ঠে। তাদের কাছে গান্ধী-ভাবনা এক ধরনের আত্মার কাজ করে। সমাজে সাম্যতা নিয়ে বহু দার্শনিক-ই নিজস্ব ঘেরাটোপের মধ্যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, কিন্তু আত্ম-বিশ্লেষণের দ্বারাও সমাজের পূর্ণতা সম্ভব, সেটা গান্ধীই দেখিয়েছেন। সোজাসাপটা কথায়, গান্ধীর সমাজ দর্শনের মূল আধারই ছিল আত্ম; আত্ম-কেন্দ্রিকতা নয়, আত্ম-উপলব্ধি বা বিশ্লেষণের দ্বারা সমাজ কল্যাণ। এই সমাজ কল্যাণের তাড়নায় গান্ধী কিছু পন্থার নির্দেশ করেছে – অহিংসা, স্বরাজ, সত্যাগ্রহ। আসলে, এই পন্থাগুলি একে অপরের পরিপূরক, ও সম্পর্কযুক্ত। আলোচ্য নিবন্ধে গান্ধীর সত্যাগ্রহ পন্থাটির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করার প্রয়াস দেখতে পাওয়া যাবে।

প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির শব্দ ‘ সত্যাগ্রহ’ অভিধানিক অর্থ সত্যের প্রতি আগ্রহ। সত্য সন্ধানে সমস্ত বেড়াজালকে অতিক্রম করার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই নিহিত আছে সত্যাগ্রহ। সহিংস কৌশলের বিপরীতে সত্যাগ্রহ, কারন ব্যক্তির পক্ষে চূড়ান্ত সত্যকে জানা সম্ভবপর নয়, যার ফলে বিধানও প্রযুক্ত করা যায় না (*Savita Singh, Satyagraha, Publications Division, Ministry of information and broadcasting, Govt. of India, 2007, Page-4)।* তাই, আধ্যাত্মিক বাস্তবতাই হল সত্যের সর্বোচ্চ অধ্যায় এবং অহিংস দর্শনের মাধ্যমে এই সত্যের জীবনের দিকে অগ্রসর হওয়ার একমাত্র পন্থা, যে আধ্যাত্মিকবাদের প্রসঙ্গটি ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। সুনিদিষ্ট অর্থে, আত্মত্যাগের মাধ্যমে সত্যের সততাকে প্রমান করাই ছিল গান্ধীর কাছে সত্যাগ্রহের প্রাতিষ্ঠানিক সারবত্তা; যা প্রতিমুখের প্রতি ব্যাথা ও কষ্ট না দিয়ে ভালবাসার এক রূপ। অহিংসার পরিমণ্ডলে সত্যাগ্রহকে

সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে ‘ ক্রমান্বয়ী’ (Gentle) (হরিজন পত্রিকা, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৩৩ পৃষ্ঠা ৮) রূপে, যা বাধ্যবাধকতা ও সহিংসতার সম্পূর্ণ বিপরীতের পদ্ধতি। বিরোধ সমাধানের সত্য উপায় হিসাবে ব্যক্তিকে এখনও পর্যন্ত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গান্ধীর সত্যাগ্রহকে উপলব্ধি করতে হবে।

১৯০৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা গান্ধীজী সত্যাগ্রহ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। রাজনৈতিক লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসাবে সত্যাগ্রহকে গান্ধীজী বর্ণবাদ ও উপনিবেশিকতাবাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন। আবার, সত্যাগ্রহকে তিনি দেখেছিলেন আত্ম-নির্ভরতা ও উপলব্ধির স্তম্ভ হিসাবে। হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া বিপরীতে কোনো প্রকার ফলাফলের চিন্তা থেকে বিরত রাখার জন্য তিনি এই আত্ম-নির্ভরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। এটি এক ধরনের কৌশল বা পদ্ধতি, যা মানসিকভাবে ব্যক্তিকে দৃঢ় করে তুলতে সাহায্য করে। আবার, এই দৃঢ়তা দ্বারা সমাজের মধ্যে এই ধরনের সমঝোতা গড়ে ওঠে, যা আবার বৈধতার প্রশ্নটিকে উত্থাপিত করে।

গান্ধীর ‘সত্যাগ্রহ’ শব্দটি কোনো একক ধর্মীয় সংস্কৃতির বা গ্রন্থের (ধর্মীয় বা দার্শনিক) অন্তর্ভুক্তি নয়, জীবনপ্রবাহের অভিজ্ঞতার দ্বারা গান্ধীর সত্যাগ্রহ উর্বরতা লাভ করেছে। গান্ধীর জীবনপ্রবাহে জৈন পরিবার, হিন্দু ধর্মগ্রন্থ এবং সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির অপরিসীম প্রভাবের সঙ্গে আইন শিক্ষার্থী/ব্যবহারজীবী হিসাবে লন্ডন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালীন পশ্চিমী সংস্কৃতির সংস্পর্শ এবং থেরো, টলস্তয় ন্যায় দার্শনিকদের মানবতা-সম্পর্কিত লেখনিগুলি গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। গান্ধীর জীবনপ্রবাহে ভগবৎগীতার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম এবং গান্ধীর দৃষ্টিতে বিশ্বকুলের অহিংস আধারের প্রশস্তি হল ভগবৎগীতা। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন সংস্কৃতিতেও অহিংসার কথা বলা হয়েছে, যা সত্যাগ্রহের চিন্তাধারার এক অন্যতম নির্দেশক। অন্যদিকে, পশ্চিমী দার্শনিক হেনরি ডেভিড থেরো, লিও টলস্টয়-এর রচনাগুলিতেও অহিংসা, অসহযোগের কথা বারেবারে উঠে এসেছে, যেগুলি ছাত্রাবস্থায় লন্ডনে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যবাদের আন্দোলনের সময় গান্ধীকে সত্যাগ্রহ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীতভাবে সাহায্য করেছিল। A. L. Herman তাঁর “*Satyagraha: a new Indian word for some old ways of Western Thinking*” প্রবন্ধে সত্যাগ্রহ আদর্শের অন্তঃসারগুলি ভারতীয় সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হলেও গান্ধীর সত্যাগ্রহের বৃহৎ অংশ জুড়েই ছিল পশ্চিমী চিন্তকদের প্রভাব। গান্ধীজী নিজেই উল্লেখ করেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন সময়ে থেরো, তলস্টয় ও রাস্কিনের মত দার্শনিকদের লেখনিগুলি তাঁর সত্যাগ্রহ দর্শন রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্ব রেখেছিল। অসহযোগ, অহিংসার মতো সত্যাগ্রহের মূল উপাদানগুলি পশ্চিমী দার্শনিকগণের লেখনিতে সমৃদ্ধতার সঙ্গে স্থান পেয়েছিল। ফরাসি বিপ্লবকে যথাযথভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের প্রকৃত প্রতিষ্ঠান হিসাবে

বর্ণনা করা হয়েছিল (D. C. Grover, Satyagraha and Democratic Power Structure, The Indian Journal of Political Science, January-March, 1977, Volume-38, No-1, page-10)। আর, এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের মধ্যেই নিহিত আছে সত্যাগ্রহের আত্ম-নির্ভরশীলতা ও আত্ম-বিশ্লেষণ।

বর্ণবৈষম্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে রোধ করার জন্য আবশ্যক জনমানসের সক্রিয় যোগদান। সমাজের সমস্ত বর্গ একতা প্রতাপশালী এই মতবাদগুলিকে নিষ্ক্রিয় ও অবলুপ্ত করতে সাহায্য করে। বিংশ শতকে বিশ্বের পিছিয়ে পরা সমাজ বা দেশগুলিতে এই শক্তিগুলি প্রতাপ বৃদ্ধি পাওয়ার মূলেই ছিল সেই অঞ্চল বা দেশগুলির অসমসত্বের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব। ঔপনিবেশিক পর্বে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রিটিশ ভারতের জনমানসকে বৈষম্যতার নিরসনকল্পে সামাজিক ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়া আবশ্যক ছিল। এই সামাজিক অসাম্যের দৃষ্টিকোণ গান্ধীর রাজনৈতিক মননে গুরুত্ব পেয়েছিল। অসমসত্ত্ব ভারতীয় সমাজকে উপনিবেশিক-বিরোধী সংগ্রামের সফলতার একমাত্র পন্থায় ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সংগঠিত হওয়া। গান্ধী বিশ্বাস করতেন, সত্যাগ্রহের দ্বারা ব্যক্তি/সমাজের নৈতিক আধার গঠন হবে এবং সেই নৈতিকতার দ্বারা সামাজিক ভেদাভেদের নির্মূলকরণ সম্ভব হবে, যা শাসকের শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করবে। রাজনৈতিকভাবে এই সত্যাগ্রহকে সফল করার তাগিদে তিনি কিছু পদ্ধতি বা কৌশল অনুশীলনের উপর জোর দিয়েছিলেন, যেগুলির আবার ব্যক্তি/সমাজের নৈতিকতাকে সুগঠিত করবে। অর্থাৎ, ঔপনিবেশিক সরকারের শাসনযন্ত্রকে শান্তিপূর্ণভাবে অচল করার তাগিদে হিংসার আশ্রয় না নিয়ে বয়কট বা অসহযোগিতার মাধ্যমে সত্যাগ্রহের প্রদর্শন করে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা, ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রীর অহিংসভাবে বর্জন এবং গণনাগরিক দ্বারা অনশনের মাধ্যমে প্রতিবাদ সহ নানান অহিংস পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, যা ন্যায় ও সাম্যের লড়াইয়ে আজ ব্যাপকভাবে নিযুক্ত রয়েছে।

গান্ধী ভারতীয় সমাজের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ভাবনাকে জাগরূক করার লক্ষ্যে সত্যাগ্রহকে ব্যবহার করেছিলেন। গান্ধীর ভারত-আগমনের পূর্বে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই শ্রেনীর অভাব-অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অহিংসতার মাত্রা অতিক্রম করে হিংসাত্মক পর্যায়ে পৌঁছেছিল। গান্ধীর প্রাথমিক পর্বের তিন আন্দোলনে (চম্পারন, খেদা, ও আমেদাবাদ) কৃষক ও শ্রমিকদের দাবীগুলি সত্যাগ্রহের মাধ্যমে শাসকবর্গের কাছে উত্থাপিত করা হয় এবং তা সাফল্য লাভ করে। পরবর্তী পর্যায়ে

গান্ধীজী ব্রিটিশ বিরোধিতার লক্ষ্যে সত্যাগ্রহের মাধ্যমে ধর্ম, লিঙ্গ, বর্ণ, ও বর্গকে জাতীয়-ভাবনার পরিকাঠামোতে অন্তর্ভুক্তিকরণের কাজ করেছিলেন।

জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীর সত্যাগ্রহ ভাবনার বাস্তবায়নের কেন্দ্রিকতা ছিল ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ। এই শাসন-শোষণের নিরসনকল্পে গান্ধী বিভিন্ন বর্গের মধ্যে সমঝোতা, নৈতিক উন্নয়ন বা আত্ম-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উপরে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আসলে, সত্যাগ্রহের প্রতিটি উপকরণ-ই তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির আধারে গ্রহণ করা হয়েছিল, যেগুলি আবার এককভাবে এক ধরনের দার্শনিক প্রয়াসের কথা বলে।

.....

মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর ধর্মীয় জীবন

অঙ্কন রায়,
শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ,
মহেশতলা কলেজ

"হে গৌরব ও গোলামীর দেশ

হে অচির সামাজ্যের দেশ

হে মৃত্যুঞ্জয় মহিম চিন্তার দেশ

হে কাল স্পর্ধিত অযুত সন্তানের দেশ

হে নবজাগ্রত ভারত

তোমাকে"……

সার্বিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় প্রেক্ষাপটকে অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বের কাছে বর্তমানেও গ্রহণযোগ্য। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী প্রদানের কৌশল আমাদের সমৃদ্ধ করে। কঠোর নিয়মবর্তীতা এবং সত্যের প্রতি প্রবল আগ্রহ গান্ধিকে সমস্ত ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত করতে সাহায্য করেছিল। তাঁর এই শৃঙ্খলা ও সত্যের প্রতি আগ্রহ গড়ে ওঠার মূলেই জীবনপ্রবাহের অভিজ্ঞতা। প্রাথমিকপর্বের এই অভিজ্ঞতা গান্ধীর জীবনে এসেছিল ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির হাত ধরে। আলোচ্য নিবন্ধে ভারতীয় সনাতনী সংস্কৃতি কিভাবে গান্ধি ও তাঁর চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল, তার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

জৈন পরিবারের সংস্কৃতি ব্যক্তির প্রতি গান্ধীকে অহিংস হতে শেখায়, যার দ্বারা পরবর্তীতে ৩০ কোটি মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ ভাবধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কারনে তিনি শিখে ছিলেন আধ্যাত্মিকতা ধারনার মূল মন্ত্রটি। তাঁর ব্যক্তিজীবনের আদর্শের মধ্যে অহিংসা ও প্রেমই ছিল মন্ত্র, যার মূলেই ছিল ভগবৎগীতা। শৈশব থেকেই যে তিনি ধর্মীয় শিক্ষার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন এমনটা নয়। কিন্তু তাঁর ব্যবহারিক জীবনে কার্যকারী বুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞান ছিলো যথেষ্ঠ, যার তাঁর চরিত্রকে দৃঢ় করে তুলতে সাহায্য করেছিল।

তিনি নিজে শৈশবে শিক্ষা প্রাঙ্গনে বারবার তাঁর ধর্মীয় মননশীলতার ভাবনাকে অনুভব করেছিলেন। তবে তাঁকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী বহুবার আঘাতও সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর আস্তিকতার বিশ্বাস থেকে তিনি কখনই অন্য ধর্মীয়

আঘাত মেনে নিতে পারতেন না। তবে তিনি লৌকিক হিন্দুধর্মের মূল উৎস দেবদেবীর মন্দিরগুলি হতে ধর্ম লাভ ও ভক্তি লাভ করেন নাই। তিনি নিজে বাল্যকালেই ধর্মীয় ভাবধারার সাথে ঈশ্বরের ওপর আস্থা নিয়ে ছিলেন। কারণ তিনি ব্যক্তিজীবনে ভূতপ্রেতের ভয় করতেন। দৈন্যদানবের নাম শুনলেই কার্যত কাঁপিয়া উঠত। কিন্তু তাঁর ছোটবেলার পালনকারী একজন মহিলা যাকে তিনি 'দাই-মা' বলে ডাকতেন, তাঁর কাছ থেকে রাম নামের সাথে খুব শক্তিশালী ঠাকুর ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই 'রামজীই' মহাত্মার জীবনে ধর্মের আলোকে প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন।

রামায়ণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সেই আগ্রহে 'লাধা মাহারাজের' মুখে রামায়ণ পাঠ তাঁকে আরো বেশি করে রামায়ণ প্রীতি জাগিয়ে তুলেছিল। রামই ছিল তাঁর কাছে পিতৃভক্তি, রামেই ছিল সত্যরক্ষা, রামেই ছিলেন প্রজাবৎসল ও মহান ত্যাগ তা তাঁর মনে আদর্শ মূর্তি রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। কিন্তু রামের প্রতি গভীর ভাবাবেগ থাকলেও বাল্যকালে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি ছিল অভক্তি। কারণ হিন্দুধর্ম ও দেবতাকে নিয়ে যে গালি দেওয়া হত তা তাঁকে আঘাত করেছিল। কিন্তু তাসত্ত্বেও সর্বধর্মের নীতি ও দর্শনগত জ্ঞান তাঁর কম ছিল না। তাঁর যে বাড়ির পরিবেশ সেই গৃহস্থ পরিবেশে তাঁর পিতা জৈন্য ভক্তদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। এছাড়াও অনেক মুসলমান ও পারসিক বহু বন্ধুবান্ধব তাঁদের বাড়িতে আসত তাঁদের নিজ নিজ ধর্মে যে তর্কবিতর্ক হত তা গান্ধী শুনতেন। গান্ধীর কাছে 'সকল ধর্মই এক ও সত্য'। তিনি সর্বদা এই বাণীই প্রচার করতেন।

১৯২১ সালে গান্ধীজি লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি নিজের ধর্মীয় ভাবনা সম্পর্কে বলেছিলেন ৪টি কথা----

- আমি বেদে, উপনিষদে, পুরানে এবং হিন্দু শাস্ত্রের নামে যাহা কিছু চলিতেছে, তাহার সব কিছুতেই আমি বিশ্বাস করি। সুতরাং আমি অবতার ও পূনজন্ম মানি।
- আমি বর্ণাশ্রম ধর্মে বিশ্বাস করি, আমার মতে যাহা খাঁটি বৈদিক ধর্মাশ্রম ধর্ম। কিন্তু আমি বর্তমানে প্রচলিত অমার্জিত তথাকথিত বর্নাশ্রমে বিশ্বাস করি না।
- আমি গো সেবায় বিশ্বাসী--- উহার প্রচলিত অপেক্ষা প্রশস্ততর অর্থে-ই।
- আমি মূর্তি পুজায় অবিশ্বাস করি না। (মহাত্মা –গান্ধী, রোমা রোলা। অনুবাদ- ঋষি দাস, পৃ. ২৩-২৪)

ঈশ্বরের প্রতি তার আস্থা এতটাই প্রবল ছিল যে স্বাধীনতার পূর্বকালে ‘দুর্যোগের ঘনঘটায়’ ঈশ্বরের আস্থা রেখে আলোর সন্ধানের উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজেই বলতেন আমি আস্তিক মানুষ ছিলেন। ঈশ্বরে ছিল তাঁর জীবনের ধ্যানজ্ঞান। গান্ধীজির মতে প্রতিটি ধর্মই বড়। প্রতিটি ধর্মের মধ্যে এক ও অনন্য দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্ত ছিল। তাঁর মতে ভারতের বৃহৎ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজনীতি একটি মুখ্য বিষয়। ধর্মীয় ভাবধারা ভিন্ন থাকলেও রাজনৈতিক জীবন হওয়া উচিত ধর্ম নিরপেক্ষ। তাঁর ধর্মীয় চিন্তাধারা গভীর ভাবে এতিহ্য বিরোধী ও উদারপন্থী। তিনি ধর্মগ্রন্থের নতুন পাঠককে উৎসাহিত করেছিলেন ও সর্বধর্মের মধ্যে অন্তঃসংযোগমূলক আলোচনার জায়গাও করেছিলেন। তাঁর এই ধর্মীয় ও পরিবারভাবনা রাজনৈতিক জীবনে অহিংসার মার্গে নিয়ে গিয়েছিল। তেমনি তাঁর নিরামিষ খাদ্যাভাস ব্যক্তিজীবনের সেই পরিমন্ডলে এক গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে। আবার সেই সঙ্গে ধর্মীয় আস্তিকতায় জীবনের শেষ দিন ৩০ জানুয়ারী ১৯৪৮ সালে “হ্যায় রাম – হ্যায় রাম” বলতে বলতে মহাত্মা আমাদের থেকে চির বিদায় নিয়েছিলেন। এই ধর্মীয় ভাবাবেগ ও রাজনৈতিক জীবন আমাদের কাছে এক মতাদর্শ রূপে চিরস্থায়ী হয়ে আছে।

.....

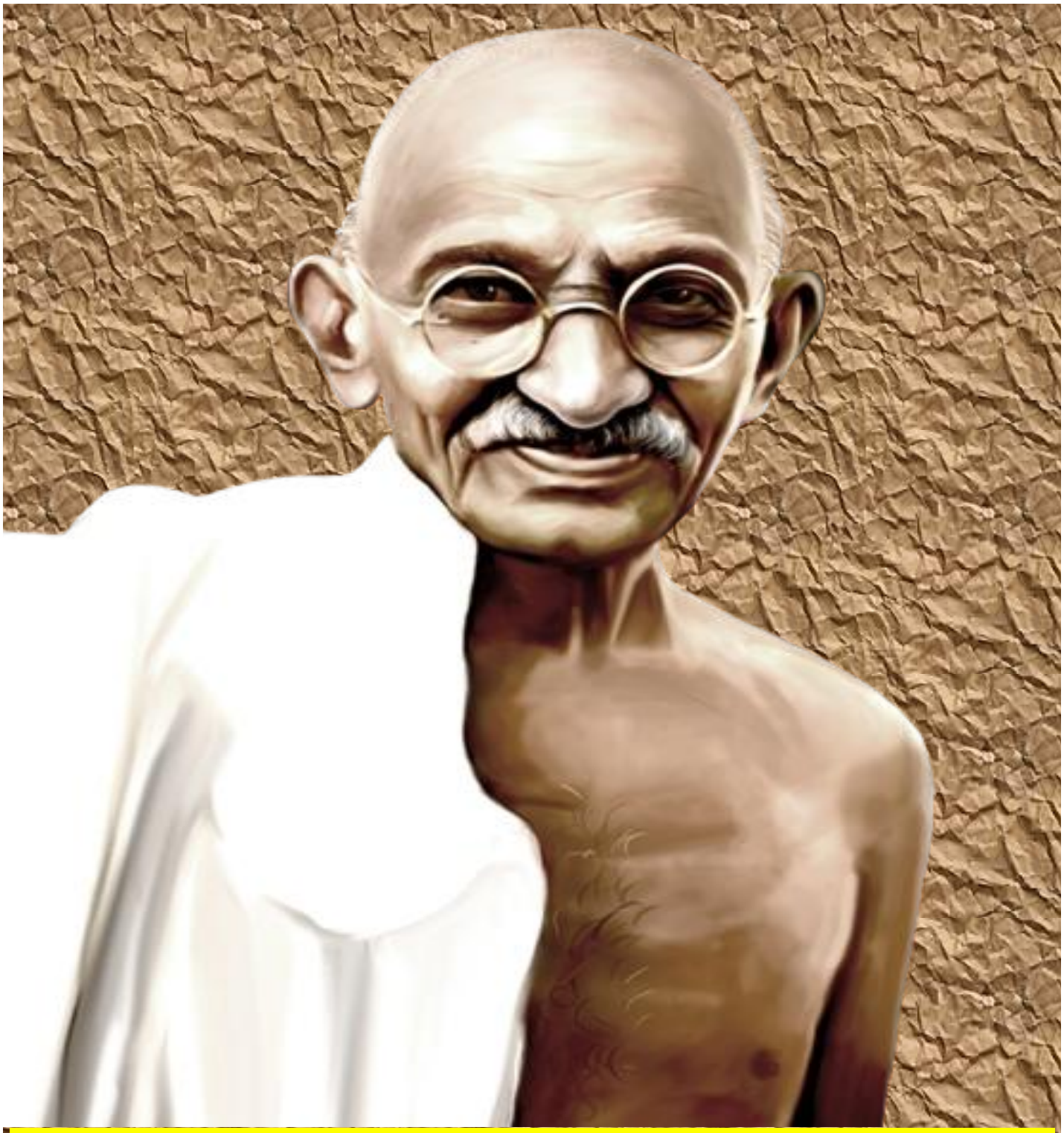

পড়ুয়াদের কলম

আইন অমান্য আন্দোলনে দক্ষিন চব্বিশ পরগণা

মেরী আফরোজ
পঞ্চম সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ
মহেশতলা কলেজ

উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় রাজনীতির ধারায় 'গান্ধী' শব্দটি কোনো ব্যাক্তি বিশেষের নামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বের অগণিত অহিংসবাদী, মুক্তিকামী মানুষের কাছে প্রেরনাকারী ব্যক্তিত্ব হিসাবে বর্তমান রয়েছে। ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা, অহিংস মানবদর্শন গান্ধীজিকে কখনও ব্রিটিশ শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে অনন্য প্রতিবাদ বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধে আত্মিক প্রচেষ্টায় আবার কখনও সার্বিক জীবনদর্শনের দ্বারা সমাজ গঠনের শিক্ষকের পালন করতে সাহায্য করেছিল। এক্ষেত্রে, গান্ধীজির এই রাজনৈতিক ও দার্শনিক কর্মসূচীর মূল আধার ছিল অহিংস সত্যাগ্রহ। তাই, আমরা দেখতে পাই, গান্ধী পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনগুলির মূল উদ্দেশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা হলেও একটি নির্দিষ্ট পন্থার দ্বারা ভারতীয় সত্তাকে স্বয়ংসম্পূর্ন গড়ে তোলার প্রয়াসের প্রক্রিয়াটি, যা তৎকালীন সময়ে সর্বভারতীয় মননকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। আলোচ্য নিবন্ধে, এই অহিংস সত্যাগ্রহ দ্বারা পরিচালিত গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলন আঞ্চলিক স্তরের জনসাধারণের মধ্যে কিরূপ প্রভাব পড়েছিল, তার বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা করা হবে।

কলিকাতা পার্শ্ববর্তী চব্বিশ পরগনা জেলা আন্দোলন ও সমাবেশের বিশেষ করে কৃষক ও ছাত্র আন্দোলনের জন্য অধিক পরিচিত। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী বিপ্লবাত্বক্ত কর্মকাণ্ড দেখতে পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক সরকারের সঙ্গে আপস করে স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নয়, চাই দুর্দমনীয় দৈহিক শক্তি ও মানসিক সাহস। এই উদ্দেশ্যকে সমানে রেখেই বাংলার বিভিন্ন জেলায় ন্যায় চব্বিশ পরগনা জেলার যুবকরা বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি ও সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। ডায়মন্ডহারবার লাইনের ন্যাতড়া রেল স্টেশন ও

চিঙড়িপোতা (সুভাষগ্রাম) স্টেশন ও গার্ডেনরিচ্ মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি সরকারী স্থানে স্বদেশী ডাকাতির দ্বারা সংগঠনের শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন জেলার স্বাধীনতা বিপ্লবীরা। এই সকল বিপ্লবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ও হীরক কুমার চক্রবর্তী। পরবর্তীতে, গান্ধী-পরিচালিত

আন্দোলনগুলিতে এই জেলার কৃষক ও বন্দর-সংলগ্ন কলকারখানার শ্রমিকশ্রেনী ব্রিটিশ বিরোধিতায় মুখর হয়েছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়কালে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন এক নতুন মাত্রা পায়, যা ছিল অনেক বেশি ফলদায়ক দক্ষিণ আফ্রিকা ফেরত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস সমাজের সর্বস্তরের ব্রিটিশ-বিরোধিতাকে গ্রহণযোগ্য করে গড়ে তুলেছিলেন। জাতীয় রাজনীতিতে গান্ধী এই যোগ্য অভ্যুদয়কে জহরলাল নেহেরু 'আলোর ঝলক' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর আগমনে জাতীয় সংগ্রাম প্রকৃত অর্থে সর্বভারতীয় গন-আন্দোলনের চরিত্র ধারন করেছিল। সত্যাগ্রহকে ভারতীয় রাজনীতির কাঠামোতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে গান্ধীজির প্রয়োজন ছিল সমাজের সর্বস্তরের অংশগ্রহণ। এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য গান্ধী আঞ্চলিক দাবিদাওয়াগুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, যেগুলি পূর্বে বিচ্ছিন্নভাবে সংগঠিত হয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসেই গান্ধীজি চম্পারন, খেদা, আমেদাবাদ, ও খিলাফত আন্দোলনের মতো আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপর তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ নীতিকে প্রয়োগ করেন এবং আশানুরূপ সাফল্য পান। অসহযোগ আন্দোলনে সর্বভারতীয়দের অহিংসভাবে (বিক্ষিপ্ত হিংসাত্বক ঘটনা ছাড়া) যোগদান গান্ধীকে জাতীয় স্তরের অদ্বিতীয় নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা প্রদান করেছিল। আসলে, গান্ধীজীর আন্দোলনের কিছু নিদিষ্ট সাধারন বৈশিস্ট্যের কারনেই জনমানসের মধ্যে যোগদানের প্রবল আগ্রহ দেখতে পাওয়া যায়। গান্ধীজির ১১ দফা দাবি ব্রিটিশ সরকার দ্বারা অগ্রাহ্য হলে ১৯৩০ সালে ৬ই এপ্রিল ডান্ডিতে উপস্থিত হয়ে সরকারি নিষেধজ্ঞা অমান্য করে লবণ আইনভঙ্গের মাধ্যমে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা করেন। আইন অমান্যকরণের জন্য 'লবণ'-কে বেছে নেওয়ার পিছনে গান্ধীজীর প্রবল রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রমান পাওয়া যায়। ব্রিটিশ উপনিবেশিক সরকার ভারতীয়দের নূন্যতম অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য দৈনন্দিন ব্যবহৃত দ্রবাদি 'লবণ'-এর উপর শুল্ক আরোপ করেন। অন্যদিকে, গান্ধী লবণ সত্যাগ্রহের দ্বারা সাধারন মানুষদের কাছে পেয়েছিলেন। গান্ধীর এই লবণ সত্যাগ্রহ সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতীকী সত্যাগ্রহের বিষয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল।

লবণ আইন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কাঁথী ও তমলুকের মতো ব্রিটিশ বিরোধিতায় দক্ষিন ২৪ পরগণায় মহিষবাথান গ্রাম সারা জাগিয়েছিল। মহিষবাথান গ্রামটি (বর্তমানের Salt Lake City বা বিধাননগর) কলিকাতার নিকটবর্তী হওয়ার কারনে কলিকাতা-কেন্দ্রিক স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বিশেষ করে কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি সহজেই

যাতায়াত করতে পারতেন। সতীশ দাসগুপ্তের নেতৃত্বে মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হয়। জনসাধারণকে লবণ সত্যাগ্রহে অংশ নেওয়ার জন্য স্থানীয় জমিদার লক্ষ্মীকান্ত প্রামানিক ও চারণকবি অভিমন্যু মণ্ডল দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ কতৃপক্ষ জমিদার ও সত্যাগ্রহী নেতা লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিক এবং রাইচাদ দুর্গারকে গ্রেপ্তার করেন। বস্তুতপক্ষে, এই দুইজন সত্যাগ্রহী ছিলেন বাংলার প্রথম লবণ সত্যাগ্রহী, যাদের লবণ আইনভাঙ্গার কারনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কলকাতায় মহিষবাথান লবণ সত্যাগ্রহের পরিচিত কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় ফলে, কলকাতার আইন অমান্য আন্দোলনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং মহিষবাথানের তৈরি 'লবন' স্বাধীনতা সংগ্রামীরা প্রতীক হিসাবে নিজেদের কাছে রেখেছিলেন।

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে দক্ষিন ২৪ পরগণায় অনেক বিপ্লবী সর্বত্যাগ করে ঝাপিয়ে পড়েন। চব্বিশ পরগনা জেলায় ভূতনাথ ভট্টাচার্য স্থানীয়ভাবে সেই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বেঙ্গল ভলান্টিয়ারের এই অঞ্চলের একজন অধিনায়ক ছিলেন। তাঁর ডাকেই তৎকালীন সময়ে ২৪ পরগনা জেলার বহু যুবক স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। ১৯৩২ সালে 'ওয়াটন হত্যা মামলায়' তিনি গ্রেপ্তার হন ও ছয় বছর কারাদণ্ডে দন্ডিত হয়েছিলেন। আর একজন বিপ্লবী চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী ১৯৩০ সালে গান্ধীজি আহ্বানে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন করেছিলেন। লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহন করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক তাঁকে দশ বছর কারারুদ্ধ করে রাখেন। অন্যদিকে, এই জেলার ছাত্র সমাজের মধ্যেও আইন অমান্য আন্দোলন নিয়ে প্রবল উদ্দীপনা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। ১৯৩০ সালে ৬ই এপ্রিল নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতির তৃতীয় সম্মেলনে আইন অমান্য আন্দোলনের সপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং 'আইন অমান্য কাউন্সিল'- নামক একটি কমিটির জন্য সোদপুর আশ্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদের নাম নথিভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেন।

সর্বভারতীয় লবণ আন্দোলনে আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির ভূমিকা ব্রিটিশ শাসককে চিন্তাগ্রস্থ করে তুলেছিল। বাংলার বিভিন্ন জেলাতে গান্ধীনীতির দ্বারা লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালিত হওয়াও সাথে সাথে ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবাত্ত্বক কর্মকান্ডগুলির ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল এই সময় থেকে। তমলুক, কাঁথী বা মহিষবাথানের মতো লবণ সত্যাগ্রহের সঙ্গে মাস্টারদা সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মতো ঘটনাগুলি প্রমান করে বাংলায় গান্ধীবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলন সমানভাবে পরিচালিত হয়েছিল। আর, এই দুই কর্মকান্ডের নিদর্শন দেখতে পাওয়া গিয়েছিল চব্বিশ

পরগনা জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে, যেখানে গান্ধীর ডাকে চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, ভূতনাথ ভট্টাচার্যের মতো বিপ্লবীরা আত্মত্যাগের রাস্তা থেকে অহিংস পথে ব্রিটিশ বিরোধিতায় নেমেছিলেন।

.....

গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনে অনুরূপ চন্দ্র সেন ও ছাত্র সমাজের ভুমিকা

মিতালী সাধুখাঁ
পঞ্চম সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ,
মহেশতলা কলেজ

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে গিয়ে বারে বারে এসে পড়ে ফলতা, বুরুল ও বজবজের কথা। বিশেষ করে, বুরুল গ্রাম অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরপর ডিসেম্বরে নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসকে সাংগঠনিক দিয়ে আন্দোলন পরিচালনা দায়িত্ব দেওয়া হয়। গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে 'অহিংস' শব্দটি জুড়ে দেন। কারণ, গান্ধীজী বুঝেছিলেন ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির একমাত্র দেশীয় প্রতিষেধক হল শান্তিপূর্ণ গণসংগ্রাম। ব্রিটিশ সরকারকে অসহযোগিতার মাধ্যমে অচল করতে পারলেই সংগ্রাম জয় নিশ্চিত।

বিপ্লবী নেতা-শিক্ষক অনুরূপ চন্দ্র সেন গান্ধিজির আদর্শকে সামনে রেখে আঞ্চলিক স্তরে ছাত্র-যুব এবং সর্বস্তরের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে অসহযোগ আন্দোলন সফলভাবে গড়ে তোলেন। শুধু তাই নয়, শিক্ষক অনুরূপ চন্দ্র সেন মহাশয়ের দেশাত্মবোধের টানে উদবুদ্ধ হয়ে একদল ছাত্র–যুব সমাজও আন্দোলনকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যায়। কিন্তু, জাতীয় আন্দোলনে বুরুল গ্রামের এই অবদান প্রায় অনালোচিত থেকে গেছে। আমার প্রবন্ধে শিক্ষক অনুরূপ চন্দ্র সেন ও তাঁর ছাত্র সমাজের ভূমিকা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। অনুরূপ চন্দ্র সেনের জন্ম অবিভক্ত বাংলার (বর্তমানে বাংলাদেশে) চট্টগ্রামে নোয়াপাড়া এক দরিদ্র পরিবারে, তিনি এবং মাস্টারদা সূর্য সেন ছিলেন পরস্পরের সমবয়সী বন্ধু। ১৯২০-২১ সালে গান্ধিজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন যখন সারা ভারতের স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, যুব ও সাধারন বুদ্ধিজীবীদের মনকে আলোড়িত করেছিল, ঠিক সেই সময় বুরুল উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন অনুরূপ চন্দ্র সেন।

১৯২২ সালে চট্টগ্রাম যুব বিপ্লবী নেতা অনুরূপ চন্দ্র সেন বুরুল উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কাজে যোগদান করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বুরুল উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে 'আদর্শ ছাত্র সমিতি' ও 'ডিবেটিং সোসাইটি' গড়ে তোলেন। জানা যায় যে, প্রতিদিন শনিবার স্কুল ছুটির পর এই সোসাইটির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হত।

স্কুলের এই সংগঠনের মাধ্যমে তিনি ছাত্রদের যেমন নৈতিক চরিত্র গড়ে তুলতেন, তেমনি তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে দেশপ্রেম গড়ে তুলতেন। শিক্ষক অনুরূপ চন্দ্র সেনের শিক্ষা ও আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম বিশেষ করে অসহযোগ ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন সুরেশচন্দ্র ঘোষ, কানাইলাল হাজরা, প্রভাস রায়, মুরারি শরন চক্রবর্তী, জ্যোতিষ রায়, প্রভাত প্রামাণিক প্রমুখ।

কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় যে ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক নীতির রোষে পড়ে তিনি বুরুলে বেশিদিন শিক্ষকতা ও জাতীয় আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারেন নি। তাঁর শিক্ষকতার সময়কাল ছিল মাত্র চার বছর। ১৯২৬ সালের ১৯শে ডিসেম্বর দক্ষিণেশ্বরের বোমা মামলায় তাঁকে বুরুল থেকে গ্রেপ্তার করে প্রথমে আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগার এবং তারপরে জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়ি ফরেস্টে প্রেরণ করে। ১৯৩২ সালের ৩রা এপ্রিলে তিনি সেখানেই কলেরা মারা যান।

মাত্র চার বছরের শিক্ষাজীবনে অনুরূপ চন্দ্র সেন দেশ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি গান্ধিজির আন্দোলনে সামিল হয়ে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতায় মগ্ন থেকেছেন। তাই স্থানীয় ছাত্র-যুবকদের কাছে থেকে হয়ে উঠেছিল এক অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর যোগ্য শিষ্যদের প্রভাশ রায় এবং মুরারিশরণ চক্রবর্তীর মতো শিক্ষার্থীরা পরবর্তীকালে সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে গেছেন।

প্রভাস রায় :-

১৯০৭ সালের ৪ঠা এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বুরুল গ্রামের প্রভাস রায় জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবী যুবগোষ্ঠীর অন্যতম নেতা অনুরূপ চন্দ্র সেন ওই গ্রামের শিক্ষকতা করতেন। অনুরূপ চন্দ্র সেনের অনুপ্রেরণায় প্রভাস বাবু দেশের কাজে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করেন। ব্রিটিশ সরকারের দরিদ্র কৃষকদের ওপর অত্যাচার প্রভাস রায়ের হৃদয়ে আঘাত লাগে। কলকাতার বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর বিপ্লবী সংগঠনের যুক্ত হন এবং সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের সান্নিধ্যে আসেন।

নিজেও গ্রামের কৃষকদের নেতৃত্বে ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরেই তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়, তখন তিনি আত্মগোপন করে যাবতীয় কাজকর্ম চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯৩২ সালে তিনি ব্রিটিশ সরকারের হাতে ধরা পড়েন এবং বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করেন। কারাবাসের সময় ভবানী সেন, ধরণীধর গোস্বামী, আব্দুল রেজ্জাক খান প্রমূখদের কাছে শিক্ষা নেন। ১৯৪২ সালের ভয়াবহ বন্যা ও ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ পীড়িত কৃষকদের মধ্যে সেবামূলক কাজে প্রভাস রায়

ঝাঁপিয়ে পড়েন। এছাড়া সুন্দরবনের মাছ ভেরি দখলের আন্দোলনে, অতিরিক্ত সুদখোর মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন ও ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন তাঁর নেতৃত্বে জোরদার হয়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে তুরস্কের খলিফা অবমাননা, রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকান্ড, পাঞ্জাবে সামরিক আইন জারির মত অবিবেচনামূলক নীতিগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব, খেতাব ও সম্মান ত্যাগ, সরকার অনুমোদিত স্কুল-কলেজ, আদালত, বিদেশী কাপড় বয়কটের প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধিজি শিক্ষা বয়কট কর্মসূচির মাধ্যমে সরাসরি ভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের ছাত্রদের অংশগ্রহণের পথ উন্মুক্ত করে দেন। ফলে ভারতীয় ছাত্র সমাজের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কংগ্রেসের অধিবেশন কনফারেন্সে মিলিত হয়ে অসহযোগের প্রস্তাবকে সমর্থন জানায় বিভিন্ন সংবাদপত্র এবং সরকারের নথি তথা রেকর্ডসের মধ্যেও এই আন্দোলনকে সফল করতে বাংলার ছাত্রদের অগ্রণী ভূমিকার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রেক্ষাপটে শিক্ষক অনুরূপ চন্দ্র সেন ও তাঁর ছাত্রদের অবদান স্মরণীয় হয়ে আছে।

.....

অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধীজী

সৌগত ঘোষ ও তমনাশ মজুমদার
তৃতীয় সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ
মহেশতলা কলেজ

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমরা, ভারতীয় হিসাবে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে স্বাধিকার ও স্বাধীনতাকে আত্মস্থ করে বসবাস করছি। এই স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের প্রশ্নটি কিন্তু ভারতের ইতিহাসে বেশিদিন আগে স্থাপিত ও সুগঠিত হয় নি। ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে এই দুই অধিকারের জন্য তৎকালীন আপামর ভারতবাসীকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করতে হয়েছে শাসকবর্গের সঙ্গে। আসলে, ব্রিটিশ শাসকের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করেছিল ভারতের জনমানসের নুন্যতম অধিকারের প্রশ্নগুলি। যদিও, এই অধিকার রক্ষার প্রশ্নটি বিক্ষিপ্তভাবে অঞ্চল-শ্রেনী-গোষ্ঠীগত জনমানুষের প্রতিবাদ/সংঘাতের দ্বারা কিছুটা হলেও অর্জিত করার প্রয়াস দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। নিম্ন মানসিকতার তাড়নায় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ভারতীয় জনমানসের অধিকারগুলিকে খর্ব করার জন্য ‘রাওলাট আইন’-এর মতো নৃশংস আইনগুলির সূচনা করেন।

দমনকারী রাজনীতির বিপরীতে ভারতের আপামর জনসাধারণ নিজ নিজ পন্থায় বিরোধিতার পথে সামিল হয়েছিল। বিংশ শতকের প্রারম্ভে বিরোধিতার এই পন্থা ‘চরম ও নরম’ দ্বারা সংগঠিত হয়েছিল, পূর্বে যা শুধুমাত্র ‘নরম’পন্থা রাজনীতির মধ্যে সীমিত ছিল। এই দুই বিপরীতধর্মী ব্রিটিশ-বিরোধী পন্থাকে নতুন গতি দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা-সত্যাগ্রহ।

দক্ষিন আফ্রিকায় অভিবাসী ভারতীয় ও কৃষ্ণাঙ্গদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সাফল্যের সঙ্গে যোগদানের পর ১৯১৮ সালে গান্ধীজি ভারতে পদার্পণ করেই চম্পারন, খেদা ও আমেদাবাদে আঞ্চলিক দাবীতে সত্যাগ্রহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় অগ্রসর হন। জনসাধারনকে পাশে নিয়ে কীভাবে অহিংস পদ্ধতিতে গন-আন্দোলনের দ্বারা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করে কার্যসিদ্ধি করা যায়, সেটার দৃষ্টান্ত তিনি ভারতবাসী সন্মুখে রেখেছিলেন। তাঁর এই নীতির উপর নির্ভর করেই, ১৯২০ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর গান্ধীজি নাগপুরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনের মাধ্যমে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

এই আন্দোলনের কর্মসূচীর মূলেই ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসক পরিচালিত সমস্ত ধরনের সরকারী কাঠামোকে বর্জন করে স্বদেশিকতার আদর্শে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপামর ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার এক দৃঢ় ইচ্ছা। তৎকালীন এই আন্দোলনকে সর্বাঙ্গে সাফল্যমণ্ডিত করার তাড়নায় প্রায় ১৮০ জন স্বদেশভাবনায় উদবুদ্ধ আইন ব্যবসায়ী ঔপনিবেশিক আইন বিভাগ থেকে নিজেদের অব্যহতি দিয়েছিলেন। স্বদেশিকতায় উদবুদ্ধ এই আন্দোলনের বৃহত্তর প্রভাব পরেছিল শিক্ষাক্ষেত্রে। বাংলায় ১৯২১ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে প্রায় ২০ জন করে শিক্ষক পদত্যাগ করেছিল। সরকারি অথবা সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান থেকে বহু সংখ্যক ছাত্র বেরিয়ে গিয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। এই সময় স্বদেশিভাবনাতে বহু জাতীয় বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল বাংলা, বিহার, বোম্বাই ইত্যাদিতে প্রদেশে। কাপড়ের ব্যবসায়ীরাও গান্ধীজির ডাকে সারা দিয়ে বিদেশি সুতোর ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছিলেন, ঠিক যেমনটা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলনে। ১৯২১ সালে কলকাতা মারওয়াড়ি বণিকেরা গান্ধির অনুরোধে বিলেতি কাপড় আমদানী না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

বৃহত্তর কৃষক-শ্রমিক সমাজের অসন্তোষ ও আঞ্চলিক দাবীগুলি কিন্তু ১৯২০-১৯২১ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে চরম অবস্থার দ্বারপ্রান্তের এনে দিয়েছিল। তৎকালীন সময়ে কমপক্ষে ৩৯৬টি শ্রমিক-কৃষক ধর্মঘট প্রমান করে সর্বভারতীয় স্তরে গান্ধির এই জন-আন্দোলন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর দিকে প্রবাহিত হয়েছিল। যদিও, গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন, কৃষক আন্দোলনের ফলে সর্বপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন কৃষক-ভাগচাষিরা। তবে, স্থানীয় স্তরে কৃষকরা এই স্বদেশিভাবনার আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন; যেমন, কার্থী, তমলুক কৃষকেরা চৌকিদারী কর দেওয়া বন্ধ করেছিলেন এবং ঢাকা, পাবনা, খুলনা, নদিয়া ভাগচাষীরা ভূস্বামীদের লাভ্যাংশ নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং প্রদান করতে অস্বীকার করেছিলেন।

অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা ভারতীয় সমাজের এক নতুন দ্বার খুলে দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে, জাতীয় আন্দোলনে নারী-শক্তির যোগদানের মাত্রা ছিল খুবেই কম; পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোর জন্য ঔপনিবেশিক সরকার-বিরোধীতায় নারী সমাজকে অপারক হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল। গান্ধিজি জাতীয় স্তরের আন্দোলনের সঙ্গে ‘অরন্ধন’-এর মতো সাধারন বিষয়কে স্থান প্রদান করে ভারতীয় নারী সমাজের বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। সেইসঙ্গে নারী-স্বাধীনতার অন্তরায় যথা পর্দাপ্রথা, শিক্ষাহীনতা ও প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে স্থানাভাব ইত্যাদি বিষয়গুলিকে আলোচনার পরিমণ্ডলে আনার ফলে নারী-সমাজ এই আন্দোলনের দৃঢ় কাঠামোতে পরিণত হয়েছিলেন।

গান্ধীজির বহুমুখী দৃষ্টিকোণে পরিচালিত এই আন্দোলন শুধুমাত্র আসমুদ্র-হিমাচল স্পর্শ করেছিল তাই নয়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ পূর্বের কংগ্রেসের পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনগুলি থেকে অসহযোগ আন্দোলনকে পৃথক করে দেয়। এই আন্দোলনের প্রভাব ও তীব্রতায় বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যাগুলি মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। উক্ত আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, গান্ধীজি তাঁর অহিংস ও সত্যাগ্রহকে প্রযুক্ত করে ভারতের সকল জনমানসকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, যা পরবর্তীতে সর্বভারতীয় চরিত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

.....

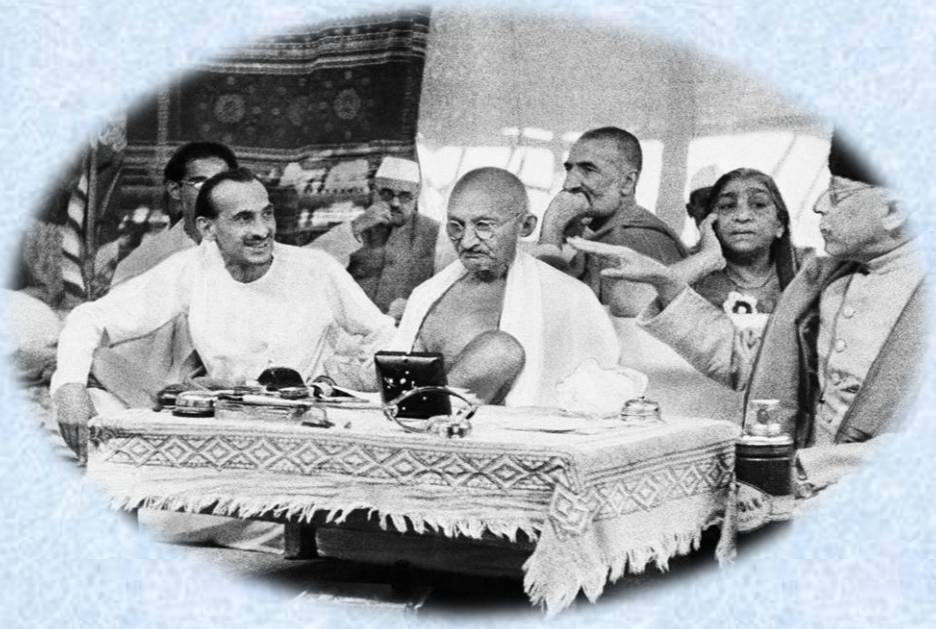

নারী কল্যাণ ভাবনায় গান্ধীজি

সুদেষ্ণা মজুমদার

তৃতীয় সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ

মহেশতলা কলেজ

বর্তমান সমাজে দাঁড়িয়ে নারীদের স্বাধীনতার কথা ভাবলে আমরা দেখবো যে, এখনও পর্যন্ত নারীরা পূর্নাঙ্গ স্বাধীনতায় পৌছাতে পারেনি বা তাদের দিতে পারে নি আমাদের এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। সুদুর অতীতকাল থেকেই এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীদের নূন্যতম সামাজিক অধিকার ও স্বীকৃতির প্রদানের ব্যাপারে কৃপণতা দেখিয়ে এসেছেন, উপরন্তু নারীকে ব্যবহার করা হয়েছে সম্পত্তি-ভোগ্যবস্তু হিসাবে সামাজিক বিধিনিষেধের (সতীদাহ, পর্দা, অবরোধ প্রথা, ও সূর্যস্পশ্যা, গৌরীদান, বাল্যবিবাহ ও, বহুবিবাহ ইত্যাদি) দোহাই দিয়ে। ফলসরূপ সমাজ গঠনে নারীদের ভূমিকা পাদপ্রদীপে উঠে আসে নি। উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক-সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলি নারী-স্বাধীনতা বিষয়ক পথকে কিছুটা প্রশস্ত করেছিল, যদিও তা সমাজের এক বিশেষ শ্রেনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল।

পরাধীন ভারতে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনগুলি নারীদের রাজনীতির আঙ্গিনায় আনতে সাহায্য করেছিল, সেই সঙ্গে তাদের স্বাধীনতার প্রশ্নগুলি সমাজে মূল ভিত্তিতে স্থান পেতে শুরু করে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ- বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে ‘অরন্ধন’-কে প্রতীকী হিসাবে স্থান পাওয়া নারীদের রাজনৈতিক ময়দানে আসার ক্ষেত্রে প্রেরনা প্রদান করেছিল। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ-বিরোধী ‘নরম’ ও ‘চরম’পন্থী আন্দোলনে ভারতীয় নারীরা পুরুষদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যোগদান করেছিলেন। গান্ধীজির জাতীয় আন্দোলনগুলিতে নারীদের ভূমিকা ছিল অপরিসীম এবং গান্ধীজি নিজেই এই আন্দোলনগুলিতে নারীর উপস্থিত উপলব্ধি করেছিলেন। পাশাপাশি বামপন্থী এবং অন্যান্য আন্দোলনগুলিতে (তেভাগা, খাদ্য, নকশাল ও চিপকো, নর্মদা-বাঁচাও) ‘নারী’ অপরিহার্য্য ভূমিকা পালন করেছিল। বিংশ শতকে গান্ধী ও গান্ধীবাদের আলোকে নারী-কল্যাণের বিষয়টি আলোচ্য নিবন্ধে আলোকপাত করা হবে।

গান্ধীজির নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন শুধুমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে ভারতবাসীকে মুক্ত করতে সাহায্য করেনি, সেইসঙ্গে তাঁর আন্দোলন পরিচালনার পন্থা সমাজের সকল স্তরের/ বর্গের মানুষকে অহিংস সত্যাগ্রহের দ্বারা জীবন অতিবাহিত করার অনুপ্রেরনা প্রদান করেছিল। জাতীয় স্বাধীনতার প্রয়োজনে চরমপন্থীদের মত আত্মত্যাগ বা

নরমপন্থীদের গোপনীয়তা না থাকার ফলে ভারতীয় নারী সমাজ সহজেই গান্ধীর জাতীয় মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অহিংসা ও সত্যাগ্রহের মহোত্তম আদর্শ প্রকৃত পক্ষে নারীর মননে নিহিত আছে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। গান্ধীর "অহিংসা ও প্রেমের দ্বারা শত্রুর হৃদয় জয়"-এর কৌশলটি 'মা', 'সহধর্মিণী', 'কন্যা'র কাছে আপন অভ্যাস বলে মনে হয়েছে। তাই বিংশ শতকের কুড়ির দশকে মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারী সমাজ রাজনৈতিক সচেতনতার একশক্তি সঞ্চয় করেছিল। তিনি মনে করতেন, নারীকে অবলা বলাটা একপ্রকার অপমানজনক, তা নারীর প্রতি পুরুষের অবিচার। শক্তির অর্থ যদি পাশবিক হয়, তবে নারীরা পুরুষের সমকক্ষ নয়, কিন্তু শক্তির যদি নৈতিক হয় তাহলে নারী অপরিমেয়শ্রেষ্ঠ।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন যেমন ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিতৃষ্ণা ও প্রতিরোধ-শক্তির প্রথম সর্বভারতীয় প্রয়াস ছিল, ঠিক তেমনি ভারতীয় নারীসমাজ জাতির কল্যাণকর কাজে সমদায়িত্বে উদ্দীপনা স্বীকৃতি পেয়েছেন। রাজা রামমোহন রায় এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় নারীর শৃঙ্খলমোচনের সূচনা করেছিলেন, ঠিক তেমনি, গান্ধীর এই আন্দোলন নারীকে স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের শক্তি প্রদান করেছিল। জাতীয় আন্দোলনে নারীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেই গান্ধী তাঁর আন্দোলনগুলির প্রতীকী হিসাবে ' অরন্ধন', ' লবণ'-এর মতো সাধারন বিষয়গুলিকে জাতীয় স্তরের সঙ্গে সংযোগ করায় নারীসমাজের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। গান্ধীর এই সিদ্ধান্তগুলি দ্বারা ভারতীয় নারীর বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন। সুচেতা কৃপালিনী মনে করেন গান্ধীর ব্যক্তিত্ব, বিশ্বাস ও অহিংস নীতির মানবিক গঠন ভারতীয় নারী সমাজকে যথেষ্ট পরিমানে অনুপ্রেরনা যুগীয়ে ছিল। শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, গান্ধীজির নেতৃত্বে মহিলারা সামাজিক ক্ষেত্রেও আত্মনিয়োগ করেছিল।

বস্তুতপক্ষে, গান্ধীজীর নারীর প্রতি বিশ্বাস অচিরেই সাফল্যলাভ করেছিল এবং ভারতের বিভিন্ন অংশের নারীসমাজ সমস্ত প্রতিবন্দকতা দূর করে গান্ধীজির ডাকে সারা দিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালের লবণ সত্যাগ্রহের সময় কলকাতার মেয়েরা "নারী সত্যাগ্রহ সমিতি" এবং ঢাকায় "সত্যাগ্রহী সেবিকা দল"- এর দ্বারা সরোজিনী নাইডু, উষা মেহেতা, বীনা দাস, লীলা রায়, কমলা দাসগুপ্তের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করেন। পরবর্তী সময়ে রাজনীতির আবর্তে নারী পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছিল। আসলে, গান্ধীর কাছে নারী ছিলেন সাহস, ধৈর্য, সহনশীলতা ও আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক, ভারতীয় সমাজের কাছে এই বিশ্বাসটি জাগিয়ে তুলেছিলেন।

ভারতে নারী-মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসের এক বৃহত্তর জায়গা স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য থেকে উঠে এসেছে। মেয়েদের শিক্ষা যেখানে অসম্ভব ছিল, সেখানে জাতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হিসাবে নিজেদের তুলে আনা প্রায় অসম্ভব ছিল। গান্ধীজির প্রায় একক প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ- বিরোধী আন্দোলনগুলিতে নারীসমাজকে অপরিহার্য অংশ হিসাবে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতৃত্বকে অভ্যাস করতে বাধ্য করেন, যার ধারা আজও বিভিন্ন জাতীয় কর্মপন্থায় দেখতে পাওয়া যায়।

.....

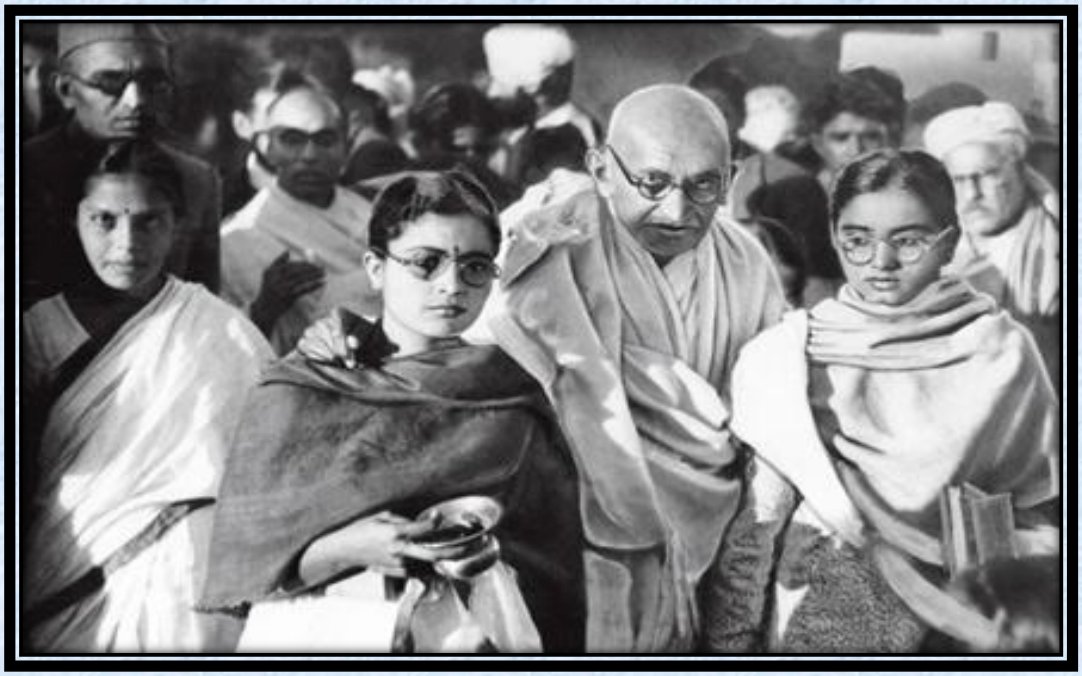

গান্ধীজী এবং তাঁর অহিংস নীতি

সুজাতা ঘোষ
তৃতীয় সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ,
মহেশতলা কলেজ

মহাত্মা গান্ধী তাঁর অহিংস আন্দোলনের দ্বারা সমগ্র ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, সেইসঙ্গে মুক্তিকামী মানুষের কাছে প্রতিবাদের নতুন ভাষায় পরিণত হয়েছেন। স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করেছিলেন অহিংসার মাধ্যমে। সেই সঙ্গে মানবসমাজের নৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে দিয়েছিলেন সত্য ও ন্যায়ের দিকে। এই অহিংসা ও সত্যের পূজারীকে আমরা জাতির জনক বা জাতির পিতা হিসাবে চিনি। ১৮৬৯ সালে ২রা অক্টোবর গুজরাতে পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'মহাত্মা' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং চরম প্রতিপক্ষ হয়েও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁকে 'জাতির পিতা' বলে সম্বোধন করেছেন। চরম ডানপন্থী থেকে শুরু করে বামপন্থী প্রায় সকলেই তাঁকে নানাভাবে আক্রমণ করে গেছেন, তাঁর চলার পথ ও পদ্ধতিকে কঠিনভাবে জর্জরিত করেছেন, কিন্তু একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন নি যে, ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সর্বভারতব্যাপী বিস্তৃতিকরণের প্রচেষ্টা তাঁর আগে কেউ করেন নি। তিনি ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনকে এক নতুন দিশা দিয়েছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনীর নাম " My Experiment with Truth" অর্থাৎ " সত্যের সঙ্গে আমার পরীক্ষা"। গান্ধীজি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাদর্শে বা রাজনৈতিক মতাদর্শের ক্ষেত্রে সত্যের সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষা আজীবন চালিয়ে গেছেন। সত্যের সাথে এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি তাঁর দুটি আদর্শ, যা ব্যক্তিগত জীবনকে তথা রাজনৈতিক জীবনকে পরিচালিত করেছিল। সেই দুটি আদর্শের ছিল 'অহিংসা' এবং 'সত্যাগ্রহ'; এই দুটি শব্দ পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, একে অপরের পরিপূরক। 'অহিংসা' আদর্শটি গান্ধীজি গ্রহণ করেছিলেন বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম তথা কিছুটা হিন্দুধর্ম থেকেও। গান্ধীজীর সাত্ত্বিক মানুষ ছিলেন, ধর্ম ধৃ-ধাতু থেকে প্রসূত, আক্ষরিক অর্থে, প্রকৃত অর্থে যে ধর্ম মানুষের সমস্ত রিপুকে অবদমিত করে, তার ভেতরের যে প্রশান্ত বিবেক আছে তাকে জাগিয়ে তোলে, সেই ধর্মের চর্চা করেছেন তিনি আজীবন। সেই ধর্ম অনুযায়ী কিন্তু তিনি অহিংসাকে দেখেছেন, এই অহিংসা এবং সত্যাগ্রহকে শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে নয়, তিনি রাজনৈতিক জীবনেও প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এবং তাঁর সমগ্র রাজনৈতিক পরিচালনা মধ্য দিয়ে আমরা এই অহিংসার প্রতিপালন দেখে থাকি।

প্রথম জীবনে গান্ধীজী পেশাগত কারণে দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন সময় তিনি নিজে বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন। সেখানকার ভারতীয়দের ভোটাধিকার সহ অন্যান্য দাবিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেছিলেন। আসলে, গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্যেই সত্যাগ্রহ শব্দটির উদ্ভব ও প্রয়োগ করেছিলেন। বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে পরপর তিনটি সফল সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পর 1914 সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসেই সত্যাগ্রহকে জাতীয় রাজনীতিতে প্রয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেন।

ভারতে ফিরেই গান্ধী সত্যাগ্রহকে সফল প্রয়োগ জন্য আঞ্চলিক সমস্যাগুলিকে গুরুত্ব প্রদান করেন, সেই উদ্দেশ্যে বিহারের চম্পারণে নীলচাষীদের উপর পুঁজিপতি নীলকরদের অত্যাচার বা খেদার কৃষকদের অভাব অভিযোগ বা আমেদাবাদের মিল শ্রমিকদের দুর্দশার চিত্র চাক্ষুষ করেছিলেন। স্থানীয় নেতৃত্বের সহায়তায় গান্ধী এই আন্দোলনগুলির সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন এবং সফলভাবে সত্যাগ্রহের দ্বারা প্রান্তিক মানুষগুলির অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। গান্ধী তাঁর অহিংসা ও সত্যাগ্রহের দ্বারা উপলব্ধি করেছিলেন এই প্রান্তিক মানুষগুলিকে যদি সর্বভারতীয় আন্দোলনগুলিতে আনতে হয়, তবে স্থানীয় সমস্যাগুলিকে প্রাধান্য প্রদান করতে হবে এবং একাজে সাফল্যলাভ করেছিলেন, যার প্রধান উদাহরণ হল পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে অহিংস অসহযোগ (1920 থেকে 1922), আইন অমান্য (1930 থেকে 1934), ভারতছাড়ো (1942) মতো বৃহৎ আন্দোলনগুলিতে আপামর ভারতবাসী উল্লেখযোগ্য যোগদান। গান্ধীজী শান্তির স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে হিংসা আশ্রয় না নিয়ে একমাত্র অহিংসার পথ অবলম্বন করে এক নতুন ইতিহাস গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বা চেষ্টা করেছিলেন। আজ তাঁর এই অহিংস পথের দ্বারাই সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ মুক্তির পথ দেখছেন।

.....

দলিত ভাবনায় মহাত্মা গান্ধী

নুরজাহান খাতুন
তৃতীয় সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ,
মহেশতলা কলেজ

'দলিত' কথাটি 'দলন' থেকে এসেছে, যার মূল অর্থ ভাঙ্গা, স্থল-নিচে, নিচু, নিপীড়িত। হিন্দি, বাংলা বা মারাঠি ভাষাতেও এর মূল অর্থই হল পেষণ, নিপীড়ন। উনিশ শতকে মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে দ্বি-জন্মের হিন্দুদের পূর্ববর্তী ' অস্পৃশ্য' বর্ণের দ্বারা নিপীড়নের প্রসঙ্গে দলিত শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মহাত্মা গান্ধী ভারতের সমাজব্যবস্থার এই সম্প্রদায়কে 'হরিজন' হিসাবে উল্লেখ করেছেন। যদিও, নরসীমা মেহেতা 'হরিজন' শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন এবং গান্ধী তা জনপ্রিয় করেছিলেন। গান্ধী ১৯৩০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক হরিজন পত্রিকার প্রথম সংখ্যা সম্পাদনা করেন এবং এই শব্দটিকে নিয়ে আসেন। আসলে, গান্ধীর মূল উদ্দেশ্যই ছিল এই সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধান করা। তিনি 'হরিজন' কথাটিকে 'হরি' অর্থাৎ ভগবান এবং 'জন' অর্থাৎ মানুষ বা সন্তান হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন, যারা ঔপনিবেশিক পর্বে সরকারি নথিপত্রে Depressed classes বলে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতের হিন্দুধর্মের জাতব্যবস্থায় দলিতদের সাধারণত অবস্থান ছিল চতুর্বর্ণের বাইরে পঞ্চমবর্ণের মধ্যে, যাদের মূল পরিচিতি ছিল দাস, দস্যু, চন্ডাল, প্রভৃতি অভিধার মাধ্যমে এবং সমাজের পঙ্কিল কর্মকাণ্ডগুলি এদের দ্বারাই করা হত। আদি পর্ব থেকেই শুধু ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতিতে এই সম্প্রদায়ের মানুষরা নিপীড়িত–নির্যাতিত হয়ে আসছে জাতব্যবস্থার ক্রমোচ্চ শ্রেণীগুলির দ্বারা। উচ্চশ্রেণীর মানুষদের সেবা করা ছাড়া দলিতদের কোনো অধিকারই স্বীকার্য হত না এই জাতব্যবস্থায়। উনিশ শতকে অধিকারের প্রশ্নে দলিত সম্প্রদায়গুলি সোচ্চার হতে দেখা যায় জ্যোতিরাও ফুলে, নারায়ণ গুরু, পেরিয়ার, নাইকার, আম্বেদকার নেতৃত্বে।

জাতীয় আন্দোলনের সর্বভারতীয়ের যোগদানকে সুনিশ্চিত করার তাগিদে গান্ধীজী সমাজের সমস্ত স্তরকে স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন। খিলাফত ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে তিনি যেমন আঞ্চলিক দাবিগুলিকে যুক্ত করেছিলেন, ঠিক তেমনি হিন্দুধর্মের মধ্যে এই অবহেলিত সম্প্রদায়গুলির জাতীয় আন্দোলনের মুখ্য ধারায় যুক্ত করার জন্য সচেষ্ট হন। ১৯২০ সালে জাতীয় কংগ্রেসের দায়িত্ব নেওয়ার পরেই গান্ধী সর্বপ্রথম জনসাধারণের

উদ্দেশ্যে অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করেন। রাজনীতিবিদ হিসাবে গান্ধী মনে করেন, হিন্দু মুসলিম ঐক্য ছাড়াও অস্পৃশ্যতার পাপ অপসারণ না করলে স্বরাজ আসবে না।

গান্ধী বর্ণব্যবস্থা ও জাতব্যবস্থার (অস্পৃশ্যতা) মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তা আজীবন পালন করে গেছেন। বর্ণব্যবস্থার প্রবল সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও জাতব্যবস্থার এই ভয়ঙ্কর বিধান (অস্পৃশ্যতা) গান্ধিকে সর্বদাই পীড়া দিয়েছিল। তিনি গান্ধীজী মনে করেন 'বর্ণব্যবস্থা যদি বৃক্ষ হয়, অস্পৃশতা তবে পরগাছার মত। পরগাছাকে কাটতে গিয়ে আমরা যেন ভুল করে বৃক্ষ কেটে না বসি''। এবং গান্ধীজীর মতে বর্ণব্যবস্থা ধ্বংস করা হলে বর্ণ এবং অবর্ণের মধ্যে রাজনৈতিক বিভাজন তৈরি করা। তাঁর এই ধারনা বিরোধিতা করেন আম্বেদকার।

১৯৩২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামস্ম্যোকডোলান্ড 'সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা' নীতির দ্বারা ভারতের এই বহুত্ববাদকে কাজে লাগিয়েছেন তার শাসকশোষণের প্রক্রিয়াকে সুরক্ষিত করার জন্য। জাতি-ধর্ম- বর্ণভিত্তিক পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গান্ধীর প্রতিবাদ সামজিক স্তরের ফাটলকে রোধ করতে পারেন নি।

পুনা চুক্তির পরবর্তীতে গান্ধী নিজেকে হরিজন আন্দোলনে নিয়োজিত করেন, হিন্দু ধর্মের মধ্যে জাত বৈষম্যবাদের নির্মূলকরণের জন্য তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন যে, "আমি পুনর্জন্ম নিতে চাই না, তবে আমার যদি পুনর্জন্ম হয় তবে আমার অস্পৃশ্য হিসাবে জন্মগ্রহণ করা উচিত"। ভারতের আধ্যাত্মিক নেতা হিসেবে অস্পৃশ্যতার দুর্দশা সর্বদাই বিচলিত করেছিল, নিপীড়িত মানুষের অধিকারের প্রশ্নটি গান্ধীর অহিংসার সমাধান করতে না পারার পিছনে ছিল বহুকালের অচলায়তন বর্ণবাদীদের বৈষম্যবাদী মানসিকতা, যার অনিবার্য পরিণতি আজও বারেবারে দেখতে পাওয়া যায়।

.....

বুনিয়াদী শিক্ষা ভাবনায় গান্ধীজি

সারিকা সুলতানা ও মেহেজাবিন খাতুন
তৃতীয় সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ,
মহেশতলা কলেজ

ভারতের ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনৈতিক ধারায় ব্যক্তিত্বের ‘ক্যারিশ্মা’ গান্ধীজির প্রধান পরিচিতি হলেও সমাজকাঠামোর মূল ভিত্তি, শিক্ষা ক্ষেত্রেও দৃঢ়তার ছাপ রেখে গেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে এক গতিশীল দার্শনিক চিন্তার জনক ছিলেন তিনি. মহাত্মা গান্ধী ছিলেন আধুনিক জগতের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি. ব্রিটিশ শাসনের সময় তিনি বুঝতে পারেন যে ভারতকে ব্রিটিশ মুক্ত করতে হলে ভারতের শিক্ষা বিস্তার ঘটানো প্রয়োজন। চিনি শিক্ষাকে সত্যান্বেষণ এবং আত্মোপলব্ধির পন্থা হিসাবে বর্ণনা করেন।

গান্ধীজী মনে করতেন শিক্ষা মানুষের নিহিত নৈতিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সবরকম সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। তাই তিনি শিক্ষার বিকাশকে তাঁর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, কারণ শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের উন্নয়নই প্রধান লক্ষ্য। এই নৈতিক বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি ১৯৩৭ সালে তাঁর শিক্ষাভাবনাটিকে বুনিয়াদী শিক্ষা নামে অভিহিত করেছেন।

ভারতবর্ষের গ্রাম অঞ্চলগুলিকে সামাজিক শুদ্ধতার উদ্দেশ্যে গান্ধীজি একটি মৌলিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁর এই শিক্ষা ব্যবস্থায় বুনিয়াদী শিক্ষা বা নাঈ-আলিম শিক্ষা বলা হয়। ১৯৩৭ সালে তিনি যখন প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের দায়িত্ব পান, সেইসময় গঠিত মন্ত্রিসভাগুলিতেই শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণ করার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি এই বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনাটি ‘হরিজন’ পত্রিকায় তুলে ধরেন। এই শিক্ষার উপরে ১৯৩৭ সালে অক্টোবর মাসে জাতীয় স্তরের প্রথম অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে এমন অনেকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলি থেকে এখনো কিছু এখানে কিছু তুলে ধরা হলো যেমন- এই শিক্ষায় শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে

বুনিয়াদী শিক্ষাকে জীবনের জন্য শিক্ষা বললে অত্যুক্তি হবে না। এই শিক্ষা ব্যবস্থা সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ভারতীয় সমাজকে এক নতুন পথে চালিত করেছিল।

1. গান্ধীজী তাঁর বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন কালে ৭ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কথা বলেছেন। এছাড়াও তিনি শিক্ষাকে জল, বায়ু ইত্যাদি মত জীবনদায়ী জিনিস হিসেবে অভিহিত করেছেন। জলবায়ু, আলো যেমন আমরা মুক্তভাবে পাই, তার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয় না তেমনি শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষাকে তাই অবৈতনিক করার কথা বলা হয়েছে।
2. এই পদ্ধতিতে ইংরেজি শিক্ষার পরিবর্তে মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুর চিন্তাশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করতে পারে।
3. এই শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষাকে স্বনির্ভরশীলতা করার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে এবং একইসঙ্গে উৎপাদন করবে এবং এই সমস্ত জিনিস বিক্রয় করে তারা নিজেদের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করবেন।

এই পদ্ধতিতে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা জারি রেখে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে ভারতবর্ষ এর মতই অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত দেশে সামগ্রিক চাহিদাকে সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা করে তার সাবধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো -

1. কায়িক শ্রমকে পাঠক্রমে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের মন থেকে কর্মবিসুক্ষ্যতা ছোটবেলা থেকে দূর হয়, ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে তারা কোনো কাজকে ছোট করে দেখার চিন্তাধারা থেকে নিজেদের বিরত রাখবেন, বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি সহমর্মিতাবোধ জাগবে।
2. এই পদ্ধতিতে কাজকে কেন্দ্র করে শিক্ষা দেওয়া এবং তার সামাজিক উপযোগীতার উপলব্ধিবোধ গড়ে উঠবে। এদিক থেকে এই শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে অংশ নেওয়ার ফলে তাদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা, প্রভৃতি সামাজিক গুণের নৈতিক বিকাশ ঘটবে, যা শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবনে আরো সামাজিক হতে সাহায্য করবে।
3. এই পদ্ধতিতে সক্রিয়তাবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠায় শিক্ষার্থীরা বিশেষভাবে আগ্রহী হয়। এই আগ্রহ শিক্ষার্থীদের যে শুধুমাত্র পাঠে অনুপ্রাণিত করে তা নয়, ভবিষ্যৎ জীবন তাদের বৃত্তিমূলক প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত করে।

বুনিয়াদী শিক্ষার একাধিক উপযোগিতা থাকার সত্ত্বেও আমাদের দেশে সফলভাবে বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ হয় নি। পাশাপাশি এই শিক্ষা পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীন কিছু অসম্পূর্ণতাও লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি হলো -

1. বুনিয়াদী শিক্ষাব্যবস্থায় অনুবন্ধন নীতি অনুসরনের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় নি। এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ শিক্ষাকে বিশেষ নির্বাচিত হস্তশিল্পের মাধ্যমে শেখানোর কথা বলা হয়েছে, এই ধরনের অনুবন্ধন স্থাপন সবসময় সম্ভব হয়না। অনেক সময় এই অনুবন্ধন কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।
2. বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রামীন ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কারন, যে পরিবেশে এই শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, তা গ্রামের জীবনের পক্ষে উপযোগী এবং শিল্প নির্বাচন গ্রামের জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভব। কিন্তু শহরের শিল্প নির্বাচন করে এই পদ্ধতিতে পড়ানো অনেক অসুবিধা আছে, তার কারন শহরের শিল্প মানেই যান্ত্রিক এবং জটিল। এই কারণে বুনিয়াদী শিক্ষা ভারতে সার্বজনীন শিক্ষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।
3. সবশেষে এই শিক্ষাপদ্ধতিতে উচ্চ বুনিয়াদী স্তরের পর আর কোনো পাঠক্রমের ব্যবস্থার কথা বলা হয় নি। ফলত, ভবিষ্যৎ শিক্ষার জন্য গতানুগতিক বিদ্যালয় এবং কলেজে যেতে হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতি তাই গান্ধীজী প্রবর্তনের পর অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। ভারতীয় সমাজব্যাবস্থায় এবং তার চাহিদার কথা বিবেচনা করে জাতিরজনক শিক্ষায় যে আদর্শ উপলক্ষ্য নির্ধারণ করে গেছেন, তাকে স্থির রেখে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

.....

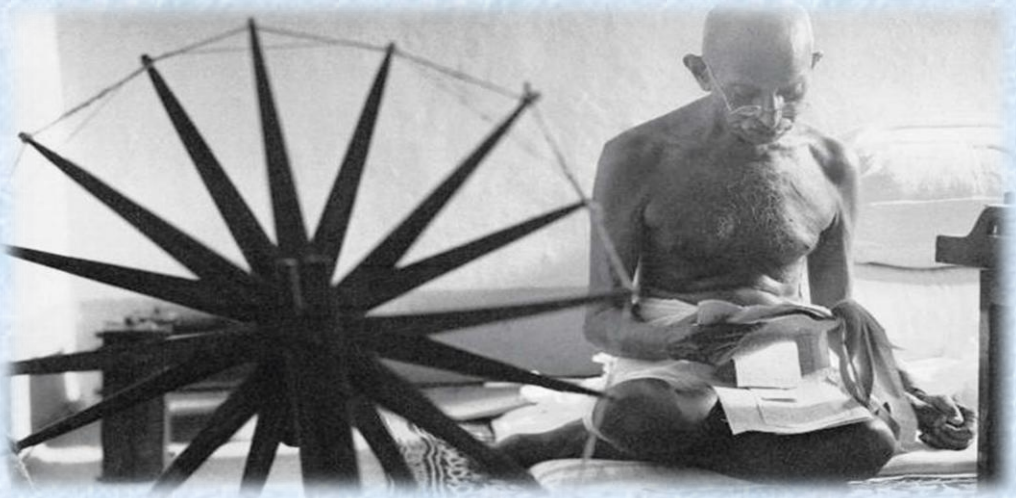

স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজী

রমা জানা ও অনিন্দিতা মণ্ডল
পঞ্চম সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ
মহেশতলা কলেজ

জাতীয় কংগ্রেসের অবিসংবাদীয় নেতা হিসাবে ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীর অভ্যুত্থান ও প্রতিষ্ঠা অর্জন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় নতুন মাত্রা দিয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিভাষিককে সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জিত করায় ভারতের আপামর জনসমাজ সংগঠিতভাবে ব্রিটিশ বিরোধিতায় নেমেছিল। তাঁর এই লড়াইয়ের কৌশল, বর্তমান বিশ্বের কাছে এক নতুন আভিধানিকের মর্যাদা পেয়েছে, যা তাকে 'নিজেই একটি আকর্ষণীয় গল্প' **(an interesting story by itself)**-এ পরিণত করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ সরকারের বর্ণবৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে গান্ধী শোষিত সমাজের মধ্যে সত্যাগ্রহের মত সমাজকে উজ্জীবিত করা দর্শনে রপ্ত করার কৌশল প্রদান করেছিলেন। যার ফলে শ্বেতাঙ্গ সরকার এক প্রকার বাধ্য হয়েই **'Indian Act"** প্রণয়নের মাধ্যমে প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি বর্ণবৈষম্যর সমস্যাকে নিরসনের প্রচেষ্টা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর এই সত্যাগ্রহ নীতি পরবর্তীতে ভারতের মতো বহু ঔপনিবেশিক শাসিত সমাজকে মুক্তির আলো দেখিয়ে ছিলেন। এই আন্দোলন চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন বর্গ বা সমাজের মধ্যে যে মতপার্থক্য বিদ্যমান ছিল, তা প্রকারন্তে শাসকের শোষণের মাত্রাকে বৃদ্ধি করে সাহায্য করেছিল। তাই প্রয়োজন ছিল এই বর্গ বা সমাজগুলির মধ্যে পারস্পারিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি করানো, এক্ষেত্রে সঞ্জীবনীর কাজ করেছিল এই সত্যাগ্রহ।

১৯১৫-র ৯ই জানুয়ারি গান্ধী তাঁর সত্যাগ্রহ দর্শনের সাধনা শক্তি ও সিদ্ধি, সাধুমূলক মাধুর্য ও বিজয়ীর গৌরব নিয়ে ভারতে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে আসার পরেই গান্ধী জাতীয় আন্দোলনের দুর্বলতার মূল্যায়ন করা এবং ভারতীয় রাজনীতিতে সত্যাগ্রহের প্রয়োগের প্রচেষ্টা শুরু করেন, সেই উদ্দেশ্যে তিনি চম্পারন, খেদা, আমেদাবাদে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে যুক্ত হয়ে পরেন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে, গান্ধীর ভারত আগমনের পূর্বে আন্দোলনগুলির মূল চরিত্র মোটামুটিভাবে এক পাক্ষিক, ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের অপসারণের মধ্যেই সীমিত ছিল। গান্ধী-কৃত প্রাথমিক আন্দোলনগুলির চরিত্র সত্যাগ্রহের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। যার ফলে ভারতীয় সমাজের মধ্যে এক ধরনের গঠনমূলক প্রক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়।

অপসারণের প্রক্রিয়ায় হিংসাত্মক কার্যকলাপের পরিবর্তে বিপক্ষের নৈতিক চিত্তের উন্নতি এবং তাঁর দ্বারা সামাজিক বৈষম্যের অবসান করা ছিল গান্ধীর গঠনমূলক উদ্দেশ্য।

গান্ধীর কাছে স্বাধীনতার অর্থ সঙ্কুচিত ছিল না, ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। উপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজকল্যাণ বিরোধী কার্যকলাপগুলি থেকেও মুক্তির কথা বারেবারে উল্লেখ করেছিল। কৃষক ও শ্রমিক সমাজের অভাব-অভিযোগগুলিকে জাতীয় রাজনীতির এজেন্ডার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। যার ফলে তিনি তাঁর আন্দোলনের দ্বারা আঞ্চলিক দাবিগুলিকে ছুঁয়েছিলেন। ভারতের ইতিহাসে নারী সমাজের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের শ্রেয় কিন্তু গান্ধির-ই প্রাপ্য। তিনি লবণ, অরন্ধন, খাদি মতো পণ্য বা বিষয়কে আন্দোলনগুলির মূল বিষয় করার ফলে অন্তঃপুরের নারীরাও ব্রিটিশ বিরোধিতায় বাইরে বের হয়েছিলেন। গান্ধী-পরিচালিত তিনটি বৃহৎ আন্দোলন বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়ে স্পষ্টতা পাওয়া যাবে।

অসহযোগ আন্দোলনে গান্ধিঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক সঙ্কট, ও ব্রিটিশ উপনিবেশ সরকার কতৃক রাওলাট আইন প্রবর্তন, স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কে উদাসীন ভারতবাসীর মননে এক অসন্তোষের বাতাবরণ তৈরি করেছিল। দেশের এই পরিমণ্ডলে গান্ধী হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে দৃঢ় করার তাগিদে খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। গান্ধী এই দুই আন্দোলনের দ্বারা আপামর ভারতবাসীকে দুটি কর্মসূচীতে অভ্যাস করেছিলেন। নেতিবাচক কর্মসূচীর মধ্যে বয়কটের মাধ্যমে উপনিবেশিক সরকার পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পদত্যাগ, এবং বিলেতি দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করার ডাক দিয়েছিলেন। যার ফলে উপনিবেশিক সরকার শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে লোকসান হয়েছিলেন। অন্যদিকে, গঠনমূলক কর্মসূচীর দ্বারা দেশি সংস্কৃতির প্রবর্তন করেছিলেন, যেমন চরকা, খাদির ব্যবহার, দেশীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা প্রদান ইত্যাদি। আসলে, অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর মাধ্যমে গান্ধী সত্যাগ্রহ পন্থার দ্বারা সমগ্র ভারতবাসী জাত, লিঙ্গ, বর্ণ, বর্গ, ধর্মের ভেদাভেদকে নির্মূল করে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীর এই কৌশলকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত গোষ্ঠীগুলি, যে চিত্রটি গান্ধী-পূর্বে ব্রিটিশ বিরোধিতায় দেখতে পাওয়া যায় নি।

আইন অমান্য আন্দোলন:

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারি "ইয়ং ইন্ডিয়া" পত্রিকাতে সরকারের কাছে ১১দফা দাবিতে মাদক দ্রব্য বর্জন, বন্দি মুক্তি, লবন কর রদ, খাজনার হ্রাস প্রভৃতি জনসাধারণের বিষয়গুলিকে ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে তুলে ধরার ফলে গান্ধীর জনপ্রিয়তা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। জনসাধারণের বিষয়ের এই দাবীপত্র ব্রিটিশ সরকার দ্বারা গৃহীত না হওয়ায় ক্ষুব্ধ ও অপমানিত গান্ধীজী বড়লর্ডকে একখানি পত্রের দ্বারা উল্লেখ করেছেন 'যে নতজানু হয়ে তিনি কেবলমাত্র এক টুকরো রুটি চেয়ে ছিলেন, বিনিময়ে তিনি পেলেন পাথর'। একপ্রকার বাধ্য হয়েই গান্ধী ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সাধারন মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক দ্রব্য 'লবণ'-কে প্রতীকী হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। প্রতীকী হিসাবে গান্ধীজী লবণকে বেছে নেওয়ার মূলে উদ্দেশ্য ছিল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রিটিশ আইনকে অমান্য করবে, যা ঔপনিবেশিক শাসনের স্তম্ভকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলগুলিও গান্ধীর ডাকে সারা দিয়েছিল। গান্ধীর এই আন্দোলনের অন্যতম বিশিষ্ট ছিল নারীদের প্রবলভাবে অংশগ্রহণ।

ভারতছাড়ো আন্দোলনঃ

৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন গান্ধী মতাদর্শের কিছুটা বাইরে সহিংসতার মাত্রাকে ছুয়েছিল। গান্ধীর চূড়ান্ত ডাকে চরমপন্থী ও নরমপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ চেয়েছিলেন। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লিনলিথগোর কথায় বস্তুত এই আন্দোলনের ব্যাপকতা ও গভীরতা দিকটি অনুধাবন করা যায়। চূড়ান্ত পর্যায়ের এই আন্দোলনকে তিনি উল্লেখ করেছেন *"Spinal stag in Indian struggle for freedom"* হিসাবে। ১৯৪২ সালে ৮ই আগস্ট গোয়ালিয়ার ট্যাঙ্ক ময়দানের সমগ্র ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে 'করেঙ্গে নয় মরেঙ্গে' শ্লোগানেই ছিল এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। ১৯৪২ সালের ২৬শে এপ্রিল গান্ধী হরিজন পত্রিকায় ভারত ছাড়ো সম্পর্কে তার মতামত ব্যাক্ত করেছিলেন। এই প্রস্তাবটিতে বলা হয় ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে অবিলম্বে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের পরিবর্তে জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং তা হবে পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতিত সম্ভব ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়ে গান্ধীর বদ্ধ পরিকরতা দেশের নানান

প্রান্তের মানুষকে স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল, যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যেবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলন অনন্য।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের সাফল্য ভারতে জাতীয় আন্দোলনে গান্ধীর রাস্তাকে সুগম করেছিল। কর্মক্ষমতায় ও আত্ম-নিয়ন্ত্রনের দ্বারা সত্যাগ্রহের সফল ব্যবহারের কৌশল তৎকালীন ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধী ব্যতিত অন্য কোন জাতীয়তাবাদী নেতার মধ্যে প্রজ্জলিত হয় নি। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনগুলির সুত্র ধরেই ভারতীয় সমাজকে সত্যাগ্রহের দ্বারা স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার প্রয়াস করে গেছেন আজীবন ধরেই। তাই, কখনও তিনি চম্পারন-খেদা-আমেদাবাদের কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীকে, অসহযোগ, ও আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বারা নারী সমাজকে, হরিজন আন্দোলনের দ্বারা সমাজের অবহেলিত দলিত সমাজকে বা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দ্বারা সমগ্র ভারতবাসীর স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা-কে ছুঁয়ে ছিলেন সত্যাগ্রহ ব্যবহারের কৌশলের মাধ্যম।

.....

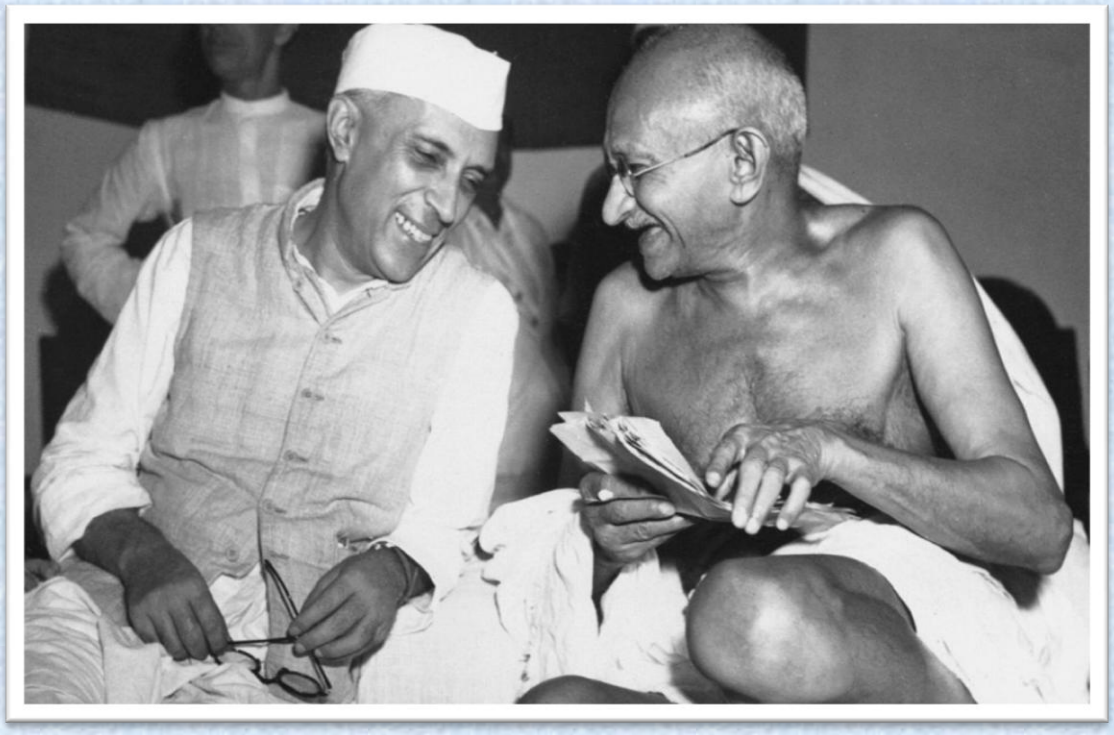

চম্পারন কৃষক আন্দোলনের আলোকে গান্ধী

মারুফা খাতুন
পঞ্চম সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ
মহেশতলা কলেজ

ভারতের ইতিহাসে মোহনদাস করমদাস গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এসে 'মহাত্মা' হয়ে উঠেছেন আঞ্চলিক সমস্যাগুলিকে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করার পরবর্তীতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় পরীক্ষিত সত্যাগ্রহকে ভারতের সন্দর্ভে প্রয়োগ করার সফলতা গান্ধীকে "Rise to Power"-এ পরিণত করেছেন। গান্ধীর প্রথমদিকের কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে সত্যাগ্রহের সফলতা পরবর্তী দিক নির্দেশনার ইঙ্গিত বহন করেছিল। আলোচ্য নিবন্ধটিতে আলোকপাত করা হয়েছে চম্পারনের কৃষক আন্দোলনে গান্ধীর সত্যাগ্রহের ভূমিকা এবং অহিংসভাবে এই কৃষক আন্দোলনের সফলতাকেও।

সত্যাগ্রহ ছিল মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রতিষ্টিত একটি দর্শন এবং অহিংস প্রতিরোধের অনুশীলনের একটি পন্থা। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে সফল সত্যাগ্রহের ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যবহার গান্ধীকে জাতীয় চরিত্র বুঝতে সাহায্য করেছিল। বিবিধ ভাষা-সংস্কৃতি-ধর্ম সম্বলিত ভারতে জাতীয় গণআন্দোলন সংগঠিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল একটি নিদিষ্ট পন্থার, যা পূর্বে নরম ও চরমপন্থীর কার্যকলাপে পরিলক্ষিত হয় নি। সমাজের সমস্ত বর্গের মধ্যে ঐক্যমত আনার জন্য তিনি সত্যাগ্রহ অহিংসাকে প্রয়োগ করেছিলেন। ভারতে গান্ধীর এই নীতির সফল প্রয়োগ দেখা গিয়েছিল বিহারের চম্পারনে কৃষক আন্দোলনের ক্ষেত্রে।

উপনিবেশিক পর্বে চম্পারন ছিল বিহারের একটি জেলা। ১৯৫০ সালে জমিদারি প্রথা বিলোপের পূর্ব পর্যন্ত এই জেলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন ছিল। এই জেলার বেশির গ্রামই বড় জমিদারিতে অবস্থিত হওয়ার ফলে একধরনের ঠিকাদারি ব্যবস্থায় কৃষিকাজ পরিচালিত হত। ইউরোপিয়ানরা এই সকল জমিদারির বৃহৎ অংশই কৃষিজমি লীজে নিয়েছিল নীল চাষের উদ্দেশ্য। অর্থকরী পণ্য হিসাবে নীল চাষ পরিচিত হওয়ার কারনে এই ইউরোপিয়ান নীলকর চম্পারনে দশ হাজারেরও বেশি চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক, ভুমিদাস এবং দরিদ্র কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করেছিলেন। চম্পারনে ব্রিটিশ সাহেবদের জন্য চাষিদের ৩/২০ ভাগ বা বিঘা প্রতি ৩ কাঠা জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করা হত। একে তিন 'কাঠিয়া' প্রথা বলে। কৃষকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নীলচাষে বাধ্য করা, স্বল্পমূল্য

প্রদান, মহাজনী অত্যাচারের বিরুদ্ধে চম্পারনের কৃষকরা ১৯১৭ সালে পিপড়া ও তুবকাওলিয়াতে বিদ্রোহ শুরু করেছিল।

বিহারের উকিল রাজকিশোর প্রসাদ ও রাজকুমার শুক্লার অনুরোধে গান্ধীজী মজঃফরপুরে উপস্থিত হন। ১০ই এপ্রিল সালে গান্ধীজীর সঙ্গে প্রখ্যাত আইনজীবীর একটি দল (রাজ কিশোর প্রসাদ, রাজেন্দ্র প্রসাদ, অনুগ্রহ নারায়ণ সিনহা, আচার্য ত্রিপালিনী) নিয়ে চম্পারন আসেন অত্যাচারিত কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। গান্ধীর সুপরামর্শে ব্রিটিশ কতৃপক্ষকে তদন্ত কমিটি করতে বাধ্য করেছিলেন কৃষক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ। গান্ধীর যোগ্য নেতৃত্বে সহিংস চরিত্রের কৃষক আন্দোলনকে সত্যাগ্রহের মাধ্যমে লক্ষ্যপূরণ করতে সাহায্য করেছিল। এইভাবে গান্ধীজী চম্পারনের কৃষিনির্ভর আন্দোলনের পরিকাঠামোকে বিস্তৃতভাবে নির্ধারিত করেছিল, যা পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে সত্যাগ্রহে সিদ্ধ হয়েছিল এবং গান্ধীর জাতীয়তাবাদকে সুগঠিত করতে সাহায্য করেছিল।

গান্ধীর কাছেও চম্পারনের কৃষি আন্দোলনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। গান্ধীজী সচেতনতার সাথে কৃষি পরিকাঠামোর মৌলিক প্রশ্নগুলির তুলনায় ছোটখাটো কৃষিজাতীয় বিষয়গুলির উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। ক্ষমতা ও কতৃত্বের অধিকারী নীলকর সাহেবদের সঙ্গে আইনি প্রক্রিয়ায় সাধারন নিম্নবিত্ত কৃষকরা প্রতিদ্বন্দ্বী করতে পাবে না। তাই, নীলকরদের বিরুদ্ধে কৃষকদের করা মামলা ভবিষ্যতে কৃষকদেরই ক্ষতি হতে পারে বিবেচনা করেই, তিনি কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের আন্দোলন করেছিলেন, যা কৃষকদের মননে গান্ধীর সম্পর্কে এক মার্জিত চিত্র অঙ্কিত হয়েছিল। আবার, সত্যাগ্রহ আন্দোলনের একটি মূল উদ্দেশ্যই হল সমঝোতা, যার দ্বারা চম্পারন আন্দোলনে রক্ত না ঝরিয়ে সফল হয়েছিল। গান্ধীজী চেয়েছিলেন একটি নিয়ন্ত্রিত গণ-আন্দোলন, এবং এভাবে উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলিতে স্বায়ত্তশাসিত পদক্ষেপের উদ্যোগ গ্রহণের কোনো সুযোগ প্রদান করেন নি এবং এভাবেই তাঁর মূল সমর্থন কৃষকশ্রেণীর, যাদের আগ্রহের বিষয়টি এই আন্দোলনে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। দরিদ্র কৃষকদের জন্য ত্রাণ ও গঠনমূলক কাজকর্মের দ্বারা গান্ধীজী সম্ভাব্য সহিংস বিপ্লবী উদ্যোগ থেকে দরিদ্র কৃষকসমাজকে দূরে রাখা যায় এবং তা মূল কাঠামোর মধ্য থেকে গৃহীত হয়েছিল।

চম্পারন সত্যাগ্রহ কেবলমাত্র গান্ধীর রাজনৈতিক কর্মজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ধারাতেও এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল। গান্ধীজী লক্ষ্য করেছিলেন যে, চম্পারন সংগ্রাম এই সত্যের প্রমাণ ছিল যে কোনও ক্ষেত্রে মানুষের বিতর্কিত সেবা চূড়ান্তভাবে দেশকে রাজনৈতিকভাবে সহায়তা করে।

চম্পারনের সত্যাগ্রহ আন্দোলন গান্ধীকে তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিল এবং প্রমাণ করেছিল যে গান্ধী-পরিচালিত এই নতুন নীতি ও পদ্ধতি ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে বিশিষ্ট ছিল।

.....

চৌরাচৌরীর ঘটনা ও গান্ধিজির অহিংস নীতি

গোপাল মণ্ডল

তৃতীয় সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ

মহেশতলা কলেজ

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা হলেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি ভারতবাসীর কাছে জাতির জনক হিসাবে সমাদৃত তাঁর সত্যাগ্রহের দ্বারা মানবকল্যাণের জন্য। অশান্তির বাতাবরণে মানব সভ্যতার কাছে মহাত্মা গান্ধী অহিংসনীতি এবং শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছিলেন। তাই, রাষ্ট্র সংঘ বিশ্ব শান্তির বার্তা প্রচারে কারনে গান্ধীর জন্মদিন ২রা অক্টোবরকে আন্তর্জাতিক অহিংসা দিবস হিসাবে উদযাপন করে থাকেন। তিনি বলেছিলেন মানুষের সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি হল অহিংস, যা সমস্ত অস্ত্রের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, তাঁর এই নীতির দ্বারা বিশ্বের অসংখ্য অবহেলিত শান্তিময় সমাজ বা ব্যক্তি অনুপ্রানিত পেয়ে থাকেন।

গুজরাটের পোরবন্দরের একটি জৈন পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী মায়ের আদর্শে শিক্ষালাভ ও মানবিকতার পাঠ নেন। জীবনপ্রবাহের অভিজ্ঞতার দ্বারা অহিংসা ও সত্যের পূজারী হয়ে উঠেছিলেন। অন্যয়ের বিরুদ্ধে অসহযোগীতা এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের দ্বারা চালিত গান্ধী ভারতীয় আপামর জনমানসের কাছে অবিসংবাদীয় নেতায় পরিণত হয়েছিলেন অল্পকালের মধ্যেই। ব্রিটিশ শাসন ও শোষন থেকে ভারতীয় সমাজকে মুক্ত হতে গেলে নৈতিকতার উন্নয়ন করা আবশ্যক, যাতে সর্বধর্ম সহনশীলতা গড়ে ওঠে এবং তা একমাত্র সম্ভব সত্যাগ্রহের দ্বারা।

চম্পারন-খেদা-আমেদাবাদের ন্যায় কৃষক শ্রমিক আন্দোলন সত্যাগ্রহের সফল প্রযুক্তি গান্ধীকে সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে করার ক্ষেত্রে প্রস্তুত করেছিল। এছাড়াও তৎকালীন বিশ্বরাজনীতি ও ঔপনিবেশিক সরকারের দমনপীড়নমূলক আইনগুলি ভারতীয় সমাজকে গণআন্দোলনের দিকে ধাবিত করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সত্য পথের দ্বারা অসহযোগ পদ্ধতিতে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ১লা অগাস্ট অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা ঘটে। অসহযোগ আন্দোলনের ধবংসাত্মক ও গঠনমূলক সত্যাগ্রহ কর্মসূচীর দ্বারা সরকারি খেতাব প্রত্যাখ্যান, সরকারি অনুষ্ঠান বর্জন, স্কুল কলেজ বয়কট, অফিস আদালত বয়কট, বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে দেশীয় সংস্কৃতির দিকে ধাবিত হয়েছিল সমগ্র ভারতের বিভিন্ন বর্গ।

অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশজুড়ে যে ব্রিটিশ বিরোধী উদ্দীপনা চলেছিল, তা সর্বত্র গান্ধীর সত্যাগ্রহের পথে অহিংসভাবে পরিলক্ষিত হয় নি। কৃষক ও শ্রমিকদের অসন্তোষ কোন কোন ক্ষেত্রে হিংসাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে ছিল, যা গান্ধীকে হতাশাগ্রস্থ করে তুলেছিল। মালাবার অঞ্চলে হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে মুসলিম মোপলা কৃষকদের সংগ্রাম নৃশংস হত্যায় রূপান্তরিত হয়েছিল এবং কোথাও তা বলপূর্বক ধর্মান্তরনের রূপ নিয়েছিল। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের এই পরিণতি জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিদ্বেষীর রূপগ্রহণ প্রক্রিয়াটি গান্ধীর আদর্শের পরিপন্থী ছিল। ক্রমাগত হিংসার প্রকোপের কারনে গান্ধী একপ্রকার বাধ্য হয়েই বারদৌলি সত্যাগ্রহকে পিছিয়ে দিয়ে ছিলেন, যেটি ছিল প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে নিয়ন্ত্রিত জনআন্দোলনের প্রথম ধাপ।

১৯২২ সালে ৬ই ফেব্রুয়ারি উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুরের চৌরিচৌরা থানার পুলিশ অসহযোগ আন্দোলনকারীদের প্রতি যথেষ্ট প্ররোচনামূলক আচারন করার ফলে উত্তেজিত আন্দোলনকারীরা থানা ঘিরে ২২ জন পুলিশকর্মীকে পুড়িয়ে মারেন এই ঘটনা গান্ধীর অহিংস নীতির দ্বারা পরিচালিত আন্দোলনকে হিংসাত্মক পরিচিতি প্রদান করেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি আন্দোলন প্রতাহার করে। অহিংসার অর্থ কেবল শান্তি বা হিংসা অভাব বোঝায় না, মহাত্মা গান্ধী যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এটি সর্বঅর্থে একটি সক্রিয় ভালবাসা, যা নিজের মধ্যে নিয়ন্ত্রন এনে অন্যকে ভালবাসতে শেখাবে। গান্ধীজী অহিংসাকে সর্বাত্মকভাবে ভারতীয় সমাজের মধ্যে রুপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু চৌরীচৌরার ঘটনা গান্ধীর এই বিশ্বাসকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

.....

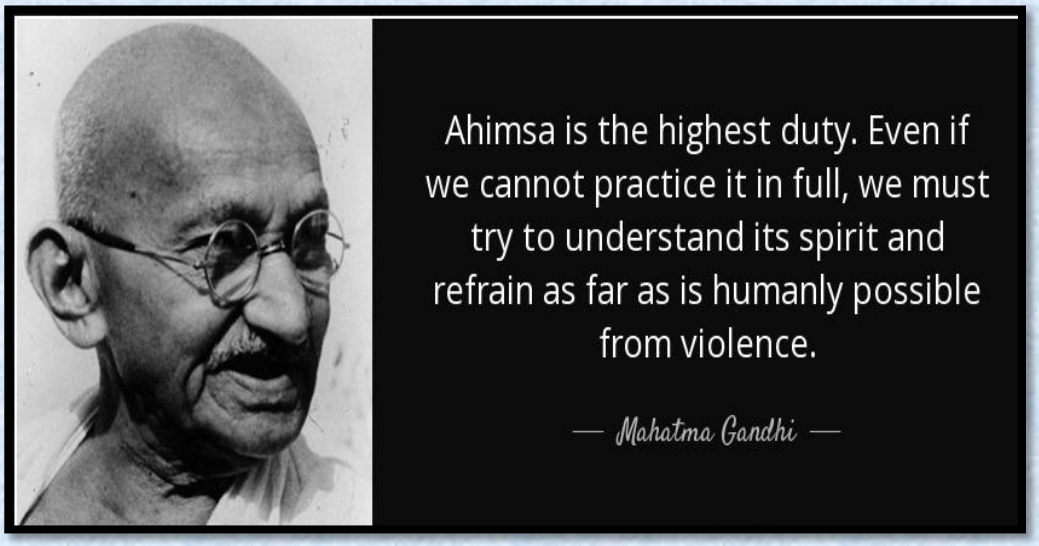

দক্ষিণ আফ্রিকার গণঅধিকার আন্দোলন (১৮৯৩-১৯১৪)

ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল
পঞ্চম সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ,
মহেশতলা কলেজ

মাবন সভ্যতার ইতিহাসে এক শ্রেণীর মানুষের অধিকার হরণ করে অবদমিত করে রাখার হয় তথাকথিত সামাজিক কাঠামোর ঘেরাটোপে বর্ণবাদ, জাতিবাদ, ইত্যাদি নামে। সমাজের উঁচু-নিচুর সংজ্ঞায় বিশ্বের উন্নত সম্প্রদায়গুলি অনুন্নতদের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য এই শোষণমূলক রীতির প্রচলন করেছেন। বর্ণবাদ আসলে গায়ের রঙয়ের বিভাজনকে ইউরোপীয় মানুষজন আফ্রিকা বা কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের উপর অধিকার ক্ষুণ্ণ করে শাসন কায়েমের একটি কৌশল। উপনিবেশিক পর্বে আফ্রিকাতে বর্ণবাদ বিস্তার লাভ করেছিল ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের হাত ধরে। দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গ মানুষজনকে ক্রীতদাস পরিণত করে নিজেদের পুঁজির বৃদ্ধি করেছিল এই বণিক সম্প্রদায়।

উনবিংশ শতকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় ৯০ শতাংশ ভূমি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল শ্বেতাঙ্গদের হাতে চলে যায়। যার প্রভাব পরে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ এবং অনাবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের উপর। এই অবদমিত মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করার জন্য বিভিন্ন আইনের প্রবর্তন করা হয়েছিল। অবদমিত শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিংশ শতকের প্রারম্ভে দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলন শুরু হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী তাদের মধ্যে একজন, যিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস কালে এই অবদমিত শ্রেণীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেছিলেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার জীবন গান্ধী চিন্তাচেতনাকে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। লন্ডনে আইনের ছাত্রাবস্থায় ব্রিটিশ উপনিবেশ ভারতের মানুষ হওয়ার কারনে বর্ণ বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন বারেবারে। পরবর্তীতে দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যারিস্ট্রারী করার সময়ও বর্ণবাদের ঘটনা গান্ধীর কার্যক্ষেত্রে ও সামাজিকভাবে ঘটেছিল। বৈষম্যের ঘটনাগুলি তাঁর পরবর্তী সামাজিক কার্যকলাপের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার পেছনে মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কৃষ্ণাঙ্গ ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্ণবাদ, কুসংস্কার এবং অবিচারের জন্য জনগণের মর্যাদা এবং অবস্থান নিয়ে চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল, ট্রান্সভাল, কেপ কলোনি ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এই সকল অঞ্চলে এশীয়দের কোনরূপ ভোটাধিকার ছিল না, মোট কথায় তাঁরা দাস, শ্রমিক মতো নিম্ন শ্রেণীর জিবিকা নির্বাহ করতেন। ট্রান্সভালে এশীয়দের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়েছিল বিভিন্ন আইনকানুন জারি করে। ১৮৯৭ সাল থেকে এই সমস্ত আইনকানুন, অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল এবং এই নিয়ে সরকারি দপ্তরে বহু স্বারকলিপিও প্রদান করা হয়েছিল। ১৯০৬ সালে ২২শে আগস্ট এই বিষয় সংক্রান্ত আইনের এক খসড়া সংশোধনী (Draft Asiatic Law Amendment) তৈরী করা হয়। এই সংশোধনীর দ্বারা অনাবাসী ভারতীয়রা বাধ্যতামূলকভাবে নিবন্ধকের কাছে শংসাপত্র নিতে বলা হয়েছিল। এই আইনকে অমান্য করলে জরিমানা, কারাবাস, এমনকি দেশান্তরে পাঠানোর বিধান দেওয়া হয়েছিল। গান্ধী এই আইনের বিরোধিতা করে বলেন, "মানুষের জন্য এই ধরনের আইন অন্যকোন দেশে আছে বলে আমার জানা নেই"।

গান্ধী এই সংশোধিত আইনের বিরোধিতা করে অনাবাসী ভারতীয়দের অধিকার আদায়ের বিল উত্থাপনের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৯৪ সালে গান্ধী নাটাল ইন্ডিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে সেখানকার ভারতীয়দেরকে রাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ করেন। এই আন্দোলনের দরুন গান্ধীকে প্রানে মারা প্রচেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি আক্রমণকারী সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেননি। কারণ তার মতে, কারও ব্যক্তিগত ভুলের জন্য পুরো দলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়াকে তিনি সমর্থন করেন না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের অধিকার নিয়ে গান্ধীর এই আন্দোলনের পন্থা ছিল সত্যাগ্রহ, যা তাঁর পরবর্তী জীবনকে প্রশস্ত করেছিল।

১৯০৬ সালে ট্রান্সভাল সরকার উপনিবেশের ভারতীয়দের নিবন্ধনে বাধ্য করানোর জন্য একটি আইন পাশ করে। ১১ই সেপ্টেম্বর জোহানেসবার্গে সংঘটিত এক গণ প্রতিরোধে গান্ধী সবাইকে এই উপনিবেশবাদী আইন বর্জন করতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, আইন না মানার কারণে তাদের উপর যে অত্যাচার করা হবে দরকার হলে তা মেনে নেবেন, কিন্তু আইন মানবেন না। এই কার্যকারী পরিকল্পনা দীর্ঘ সাত বছরব্যাপী এক আন্দোলনের সূচনা করেছিল। এ সময় আইন অম্যান্য করা, নিজেদের নিবন্ধন কার্ড পুড়িয়ে ফেলা সহ বিভিন্ন কারণে অনেক ভারতীয়কে বন্দী করা হয়েছিল এবং অনেক আহত বা নিহত হয়েছিল। সরকার বর্ণ বৈষম্যবাদী এই আন্দোলনকে প্রতিরোধ করার প্রচেষ্টায় খামতি রাখেন নি। শান্তিকামী ভারতীয়দের উপর এহেন নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য সম্প্রদায়গুলির মধ্য থেকেই প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল। অগত্যা, দক্ষিণ আফ্রিকার

জেনারেল ইয়ান ক্রিশ্চিয়ান স্মুট গান্ধীর সাথে সমঝোতা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। গান্ধীর এই অভিনব প্রতিবাদের মাধ্যমে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনাবাসী ভারতীয়দের অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং বিশ্বের সমস্ত অবহেলিত মানুষ নিজেদের মুক্তির জন্য এক নতুন কৌশল পেয়েছেন।

.....

‘‘তিহাস’’

আন্তর্জালিক পত্রিকা

ইতিহাস বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

পরবর্তী সংখ্যাঃ- আঞ্চলিক ইতিহাস ও তার সম্ভাবনা

মহেশতলা কলেজের ইতিহাস বিভাগ পরিচালিত ‘তিহাস’ ওয়েবজিন (Web Magazine)-এর ২০২০ সালের দ্বিতীয় সংখ্যার জন্য আগ্রহী অধ্যাপক, গবেষক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়াদের ‘‘আঞ্চলিক ইতিহাস ও তার সম্ভাবনা’’ নিয়ে মৌলিক চিন্তাশীল প্রবন্ধের আহ্বান করা হচ্ছে। প্রবন্ধ পাঠানোর শেষ তারিখ ৩১ই আগস্ট ২০২০। প্রবন্ধটি ইংরেজি ও বাংলায় হরফে (ইংরাজির ক্ষেত্রে The New Roman, বাংলার ক্ষেত্রে অভ্র কালপুরুষ) Microsoft Word- এ নিম্নলিখিত ই-মেলে পাঠাবেন। কলেজ পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে ৫০০ থেকে ৬০০ শব্দ এবং গবেষক ও অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে ২০০০ থেকে ২৫০০ শব্দের মধ্যে প্রবন্ধটি সীমাবদ্ধ হওয়া চাই। নিম্নলিখিত আঞ্চলিক ইতিহাস-সম্পর্কিত, বিশেষ করে বাংলার আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয় আপনাদের মৌলিক ভাবনার প্রবন্ধগুলি আমাদের ওয়েবজিন-কে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে।

বিষয়ঃ=

- আঞ্চলিক ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব
- আঞ্চলিক আন্দোলন ও সমাবেশ
- বাংলার সমাজচিত্র
- বাংলার লোকসংস্কৃতি
- আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নারী

যোগাযোগ

History.maheshtalacollege@gmail.com

ধন্যবাদান্তে,

ইতিহাস বিভাগ, মহেশতলা কলেজ

ধন্যবাদ

ইতিহাস বিভাগ, মহেশতলা কলেজ